শনির দশা

শ্রীযতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস বি-এ

প্রকাশক
শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
৩৬।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ;
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ;
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ;
ও
অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

দাম এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ,
রুদ্র প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৬৬নং, মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আমার

লীলা মায়ের

শ্রীকর-

কমলে

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

একটা কথা

'শনির দশা' প্রকাশ কর্‌বার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। শ্রীমতী ব্রজরাণী পাল, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য এম-এ, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চৌধুরী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীহরেন্দ্রনাথ সরখেল ও শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ— এঁরা সকলেই আমায় উৎসাহের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই আমাকে 'শনির দশা' প্রকাশ কর্‌তে হয়েছে। আমার ধৃষ্টতা, অযোগ্যতা ও আরো অনেক কিছুরই এ ব'য়ে পরিচয় দিয়েছি সত্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে 'গমিষ্যামি উপহাস্যতাম্' —এটাও জানি; কিন্তু সে সবের জন্য দায়ী আমি নই—তাঁরা।

ইতি—

৩রা আশ্বিন ১৩৪০ }
মহালয়া } বিনীত গ্রন্থকার

শনির দশা

এক

রাখাল সময়ে বিবাহ না করিলেও তাহার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই। বয়স একটু বেশী হইলেও তাহাকে বরসজ্জায় সাজাইলে একেবারে যে মানাইত না, তাহা নহে। সরল অন্তরের একটা সহজ চপল ভাব তাহার মুখের গাম্ভীর্য্যকে প্রায়ই চাপিয়া ধরিয়া উঁকি মারিত। পাঁচজনের কাছে সেটা ভালই লাগিত। বিধবা মা তাহার বিবাহ দিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কোনও রকমে রাখালকে রাজী করিতে পারেন নাই। বন্ধু বান্ধবেরাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। ঠাট্টায় তামাসায় তাহাকে অনেক বুঝাইয়াছিল। রাখাল তাহাদের কাহারও কথা শোনে নাই। শুধু গোটাকতক ছোট ধাঁজের 'হুঁ'—'না' বলিয়া সে তাহাদের ইসারকিতে যোগ দিত, তবু আসল কথাটা কিছুতেই বুঝিত না— বুঝিতে চাহিতও না। কাজে কাজেই সকলে থামিয়া গেল এক

কথা লইয়া কে আর মাথা ঘামায়। বহুদিন এম, এ পাশ করিয়া চুপ চাপ্ বসিয়া বসিয়া যে ছেলে দিন গুণিতেছে, তাহার সহিত তর্ক করিয়া কে আর পারিয়া উঠিবে। তাই শেষে কেহ আর তাহার বিবাহের কথা তুলিত না।

রাখালের বাপ যখন মারা যান তখন রাখালের বয়স বছর ষোল। বড় ভাই গোপাল কলেজে পড়িত। নেপাল মাত্র মাতৃগর্ভে স্থান পাইয়াছে। আর ছোট বোন অপর্ণার মুখের কথা তখনও বেশ ভাল করিয়া ফুটে নাই।

এদের দেশ ছিল এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে। কি এক সামান্য কারণে রাখালের বাপ জ্যেঠায় ঝগড়া বাঁধে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাড়ার পাঁচজনকে ডাকিয়া জমি, জায়গা, বাসন, ভদ্রাসন সবই চুল-চেরা ভাগ হইয়া যায়। তারপর স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া নিজের অংশ বড় ভাইয়ের নিকট বেচিয়া ফেলিয়া রাখালের বাপ কলিকাতায় চলিয়া আসেন। রাখালের বাপের পেশা ছিল—সদাগরী আফিসে কেরাণীগিরি। দু'বেলা ছুটিতে ছুটিতে কণ্ঠাগত প্রাণ বহিয়া ট্রেণে যাতায়াত করিতে আর ভাল লাগিল না। না লাগিবারই কথা। এক অন্নে যখন ছিলেন—তখন এ সমস্তই হাসিমুখে সহ্য করিতেন। কিন্তু আর কেন করিবেন—তাই এই সহরবাসের ব্যবস্থা।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথম বসবাস আরম্ভ হইল ভাড়াটে

বাড়ীতে। তারপর সুবিধামত একখানা ছোটোখাটো বাড়ী সহরের মধ্যে কিনিয়া ফেলিলেন। রাখালের বাপের আশা ছিল, লেখাপড়া শিখাইয়া ছেলেদের মানুষের মত মানুষ তৈরী করিবেন। তাতে তাঁর চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না। দেখিতে দেখিতে গোপাল দু'দুটো পাশ করিয়া ফেলিল। বাপের ভরসাও হইল—তবে আর কি, ছেলেত মানুষ হইয়া গেল।

কলিকাতায় রাখালের বাপের বন্ধু জুটিল অনেক। তন্মধ্যে সীতানাথ বাবু ছিলেন খুব অন্তরঙ্গ। সমস্ত সুখ দুঃখের কথা তিনি সীতানাথ বাবু ছাড়া অন্য কাহাকেও বলিতেন না।

সীতানাথ বাবুর হঠাৎ কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। বিলাতী জিনিষ এ দেশে আমদানি করিয়া এ দেশের যা কিছু বিলাতে পাঠানই ছিল তাঁর ব্যবসায়। ব্যাঙ্কের হুণ্ডী পরিষ্কার করিবার জন্যই টাকাটার বড় দরকার পড়ে। রাখালের বাপ তাহা জানিতে পারিয়া নিজের বসতবাড়ী বন্ধক রাখিয়া বন্ধুকে টাকা দিয়া সাহায্য করিলেন। এ রকম সাহায্য অনেকেই করে; কিন্তু লেনাদেনাটা পাকাপাকি করিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের কাগজে কলমে একটা কিছু লেখাপড়া হইয়া থাকে। ইঁহাদের তা' হয় নাই। এতটা অন্তরঙ্গতা পাছে নষ্ট হইয়া যায়—এই ভয়ে ও কথাটা আর কেউ তুলিলেন না।

গোপাল তখন বি, এ পড়ে—এমন সময় একদিন হঠাৎ

রাখালের বাপ হার্টফেলে মারা গেলেন। অসহায় ছেলে, মেয়ে, পরিবারের কান্নাকাটি খুবই হইল—সময়ে থামিলও আবার। গোপালের আর পড়া চলিল না। বাপের আফিসেই একটা কাজ জোগাড় করিয়া লইল। নিজের উপার্জ্জনে কোনও রকমে গোপাল মা, ভাই, বোনকে দেখিতে লাগিল। আর কি—ছেলে শিক্ষিত—তার উপর উপায়ক্ষম; মা আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। বছর ঘুরিতেই সংসারের অভাব অভিযোগের নাগপাশে আরও দৃঢ় করিয়া বাঁধিবার জন্যই তিনি গোপালের বিবাহ দিয়া দিলেন।

রাখালের পড়া গোপাল বন্ধ করে নাই। ছোট ভাইকে অর্থের অভাব মোটেই বুঝিতে দেয় নাই। গোপাল বুঝিয়াছিল, ছাত্রাবস্থায় ও চিন্তা মাথার ভিতর ঢুকিলে আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারা যায় না। রাস্তার গ্যাসের আলোয় পড়িয়া কোন পণ্ডিত দিগ্‌গজ হইয়াছিলেন—তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তাই দাদারই কৃপায় আর নিজের বাহাদুরীতে রাখাল এক নিশ্বাসে এম, এ পাশ করিয়া ফেলিয়াছে। এম, এ পাশের সঙ্গে সঙ্গে সে আরও অনেক কিছু শিখিয়াছে যথা, কেরাণীর বিবাহ করা উচিত নয়; মানুষের দাসত্ব মৃত্যুস্বরূপ; পরের দান গ্রহণ করা অবিধেয়—এই রকম বড়, ছোট, আরও অনেক।

কাজে কাজেই কেহই রাখালের বিবাহ দিতে পারিল না। বাপের আফিসে চাকরী—তাও রাখাল করিল না। অবশ্য হাতখরচা

নিজেই চালাইয়া লয়—দু' এক জায়গায় ছেলে পড়াইয়া। কি করিবে —তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে এমন একটা গোলমেলে উত্তর দেয় যে তাহা কাহারও বোধগম্য নয়। গোপাল ইদানীং আর কিছু বলে না। উপযুক্ত ভাই—বলিবেই বা কি। ইহার বহুপূর্ব্বে বাপ মারা যাবার পাঁচ মাস পরেই ছোট ভাই নেপাল তা'দের সংসারে আসিয়া দেখা দিল। সুখের বিষয়, এমন অবস্থায় যে একটা মেয়ে হয় নাই—এইটাই সকলে বলাবলি করিয়া মায়ের মনে আনন্দ দিতে লাগিল।

সীতানাথ বাবু ভদ্রতার খাতিরে মাঝে মাঝে আসিয়া খোজটা খবরটা লইয়া যান; কিন্তু বাজার খারাপ বলিয়াই হউক আর অন্য যে কোন কারণেই হউক, তিনি তাঁর স্বর্গগত বন্ধুর উপকারের প্রতিদান দিতে পারিলেন না। যথাসময়ে রাখালদের বাড়ী বিক্রয় হইয়া গেল। ভিতরের ব্যাপারটা বেশ ভাল করিয়া কেহ জানিত না। রাখালের বাপ বাড়ী বন্ধকের কথা কারোয় কিছু বলিয়া যান নাই। সীতানাথ বাবুও নীরব ছিলেন। যাক্—দেনা মিটাইয়া যা কিছু রহিল তাহাই হাতে করিয়া সকলে চোখের জল পুঁছিল। তারপর বাড়ী ভাড়া করিয়া করিয়াই রহিত। কিন্তু আর চলে না, অথচ না চলিলেও নয়, তাই সহরের বাহিরে অথচ নিকটে এমন এক জায়গায় গোপাল দেখিয়া শুনিয়া সংসার লইয়া বাস করিতে লাগিল।

শনির দশা

সীতানাথ বাবু যে একেবারেই রাখালদের দেখেন নাই, এ কথা কেউ বলিতে পারে না। তিনি নিজের ছেলেকে পড়াইবার ভার রাখালের উপর দিয়াছিলেন। মাস গেলে যা হয় তিনি সেটা রাখালের মায়ের হাতে গিয়া দিয়া আসিতেন। রাখাল আর টাকাটা চক্ষে দেখিতে পাইত না—বুঝিতও না তার পরিমাণটা কত। এ ছাড়া সে আরও এক জায়গায় মাষ্টারী করে। সেখানে যা পায় তার কিছু নিজে রাখিয়া বাকিটা দাদার হাতে ধরিয়া দেয়। কষ্টও করিত খুব; মাষ্টারী করার যন্ত্রণাটা হাড়ে হাড়ে বুঝিত বেশ। রাত্রে ছেলে পড়াইয়া হয়ত কোনও দিন বাড়ী ফিরিতে পারিত না। ফিরিবেই বা কেমন করিয়া—কোথায় সহরের কেন্দ্রে আসিয়া পড়াইবে—আর কোথায় সেই উল্টাডিঙ্গি পার হইয়া রেলের বাঁধ ডিঙ্গাইয়া রাত দুপুরে বাড়ী দৌড়াইবে। সহজ কথা ত নয়। সপ্তাহে তার এক আধ দিন এমনই হইত। বন্ধুদের একটা ক্লাবরুম ছিল; সেইখানেই মাঝে মাঝে রাখাল রাতটা কাটাইয়া দিত; কিন্তু কোথাও খাইত না কিছু হাজার পেড়াপিড়ী করিলেও—ওইটাই ছিল তার মস্ত বড় গোঁ।

দুই

এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছে। ছোট বোন অপর্ণাও বেশ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। সরোজিনীর চোখের জল আর শুকাইতে চায় না। মেয়ের কি করিবে; বাপ-খেকো ছেলে নেপালেরই বা কি উপায় হইবে; এই চিন্তাই তাঁর প্রবল হইয়া উঠিল। রাখালের জন্য আর কিছু ভাবেন না, কেননা তার পথ সে দেখিবে—উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া। গোপাল মার কষ্ট দূর করিতে খুবই চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাখালের তখনও ওই রকম মতিগতি দেখিয়া মনে মনে গোপাল তার উপর একটু অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। বড় একটা ভাইকে কিছু বলে না—বলিতে চায়ও না। রাখালও সেটা বেশ বুঝিতে পারে। বাড়ীশুদ্ধ সকলের এই আশা যে রাখাল যদি বিবাহ করিতে রাজী হয়, তাহা হইলে কিছু মোটা রকম টাকা পাত্রীর বাপের কাছ হইতে লইয়া এখন সব দিক বাঁচান যায় অর্থাৎ কি না অপর্ণার একটা ব্যবস্থা হয়। বৌদিও একদিন রাখালকে এ কথাটা বেশ খুলিয়াই জানাইল। রাখাল আগে যেমন হাসিয়া 'হুঁ' কি—'না' বলিয়া একটা তামাসা করিত এখন আর সে এ বিষয়ে কোন কথা বলে না। কাজে কাজেই রাখালের সম্মতি না লইয়া কেহই আর এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে পারিল না।

সরোজিনী কেবল গোপালকে বলেন,—'ওরে, মেয়েটার দিকে আর চাওয়া যায় না। যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা কর্। আমি নয় ওর হিল্লেটা চোখে দেখেই মরি—আর বাঁচ্ব ক'দিন!'

প্রত্যুত্তরে গোপাল কেবল এই বলিয়া মাকে সান্ত্বনা দিত—ভাব্ছ কেন মা; অপর্ণা ত এখন ছেলে মানুষ। ওর আর এমন কি বয়স হয়েছে। আজ কাল সব ঘরে ঘরেই ধাড়ি মেয়ে দেখ্তে পাবে। তখন অত ভাব্না কিসের; দেখ্ছি পাত্র—সুবিধামত পেলেই ওর বিয়েটা দিয়ে দোব। তুমি কিছু ভেবো না।

রাখালকেও সরোজিনী কথাটা বলিতেন। রাখাল কিন্তু দাদার দোহাই দিয়া পাশ কাটিয়া সরিয়া পড়িত।

ইদানীং রাখালের ম্যালেরিয়া ধরিয়াছে। এক বন্ধুর দেশে পূজার ছুটিতে বেড়াইতে গিয়া স্মৃতিরক্ষাস্বরূপ শরীরের মধ্যে ওই রোগের বীজাণু বহিয়া আনিয়াছে। বাড়ী ফিরিবার দিন কতক পরেই রোগ বেশ দেখা দিল। কুইনাইন, পাঁচন, আরো অন্য অন্য ভেজাল টনিক খাইয়াও সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইতে পারিল না। তবে আগে যেমন নিত্য শয্যাশায়ী হইয়া থাকিত—এখন সে দায় হইতে মুক্ত হইয়াছে। সপ্তাহ খানেক ভাল থাকে; আবার তার পরেই কাঁপিতে কাঁপিতে জ্বরের ধমকে বিছানা লয়। ঠিক জীবনটা তাহার যেন এই রোগের ধাক্কায় হোঁচট্ খাইতে খাইতেই চলিতে লাগিল। রাখাল এই শেষটুকু আর গ্রাহ্য করিল না। বিরক্ত

হইয়া তাহার বিপক্ষে রুখিয়া দাঁড়াইল অর্থাৎ কি না—নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ভাবিয়াই যেমন ছেলে পড়াইতেছিল তেমনি পড়াইয়া যাইতে লাগিল।

সেদিন ছিল শনিবার। রবিবারে ছুটি—ছেলে পড়াইতে হয় না। তাই শনিবারে সে অবশ্যই বাড়ী ফিরিয়া যায়, তা যত রাতই হ'ক। বাড়ীর সকলে জানিতও তাহা। সন্ধ্যার পর সীতানাথবাবুর বাড়ীতে পড়াইতে পড়াইতে গা টা তার কেমন শির্ শির্ করিয়া উঠিল। সারাদিন শরীরটাও ভাল ছিল না। একটু জড়সড় হইয়া বসিতেই থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া আর উঠিতে পারে না। পড়াইতে আর পারিল না। বাড়ী চলিয়া আসিবার জন্য জোর করিয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জ্বরের তেজ তখন এত বাড়িয়াছে যে ঘর হইতে বাহিরে আসিতে আসিতেই রাখাল কেমন পায়ে পা বাঁধিয়া পড়িয়া গেল। কপালে তার বেশ চোটও লাগিল। দেখিতে দেখিতে পেয়ারার মত কপালের বাঁ দিকটা ফুলিয়া উঠিল। রক্তও যে না দেখা দিল তা নয়। তাড়াতাড়ি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালটা পুঁছিতে লাগিল। ছাত্র সুবোধ তখন চেঁচাইয়া উঠিল—ওরে ঝি, ওরে কেষ্ট—শীগ্‌গীর জল আন্—শীগ্‌গীর জল আন্। পড়ে গিয়ে মাষ্টারবাবুর মাথা ফেটে গেছে।

তার চীৎকারে বাড়ীর যে যেখানে ছিল সবাই ছুটিয়া আসিল।

জল—পাখা বাদ পড়িল না। সীতানাথ বাবুর পরিবার রাখালের সঙ্গে কথা ক'ন্। তিনি উপস্থিত বুদ্ধিতে একরকম কপালের রক্ত পরিষ্কার করিয়া দিয়া ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন—রাখালের খুব জ্বর। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের মেয়ে সুরুচিকে ঘরে বিছানা করিয়া দিতে বলিলেন। রাখাল কিছুতেই থাকিতে চায় না। সে যাইবার জন্য উৎসুক। কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা কেহই তাহাকে সে অবস্থায় যাইতে দিল না। এক-রকম জোর করিয়াই রাখালকে বিছানায় শো'য়াইয়া দিল। তিন চারখানা গরম র‍্যাগ্ গায়ে চাপান হইল—তবু রাখালের কাঁপুনি থামিল না। বিছানায় শুইয়া সে কেবলি ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। জ্বর একটু বাড়িলেই রাখাল ভুল বকে। সেইটাই সে প্রথম প্রথম ভয় করিতেছিল। কিন্তু জ্বর তার শাসন মানিল না। রাখালও তখন এক আধটা ভুল বকিতে আরম্ভ করিল। ম্যালেরিয়া জ্বরের রীতিই এই—সেজন্য সুরুচির মা ডাক্তার আনিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইলেন না।

রাখালের আর জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। কি যে পাগলের মত অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে, তার আর ঠিক নাই। ঘরে বেশী ভিড় করা ঠিক নয়—তাই সকলকে সরাইয়া দিয়া সুরুচির মা ইলেক্‌ট্রিক লাইট্‌টা নিভাইয়া দিলেন। তিনি বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলেন না—তাঁর সংসারের কাজ তখনো অনেক অসম্পূর্ণ

অবস্থায় পড়িয়া আছে। খানিকক্ষণ মাথার কাছে বসিয়া তিনি মেয়েকে বসাইয়া উঠিয়া গেলেন। সুরুচি ধীরে ধীরে রাখালের মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে গায়ে হাত দিয়া দেখে—উত্তাপ খুব; বুকটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। বুদ্ধি খাটাইয়া একটা ছোট বালিশ বুকের ওপর রাখিয়া ডান হাত দিয়া সেটা চাপিয়া ধরিল।

রাখালের ভুল বকার অন্ত নাই। কেবলই মার কথা। মাথার কাছে সুরুচি বসিয়া আছে—তাহার পানেই জবাফুলের মত লাল চোখ দুটো টানিয়া—'মা' 'মা' বলিয়া তাকাইয়া থাকে! বালিশে মাথা কিছুতেই রাখিতে চায় না। কেবলই মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিতে চায়। সুরুচি তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজের কোলের ওপর রাখালের মাথাটা যত্নে ধরিয়া রাখিল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না কেননা আজ পর্য্যন্ত সে রাখালের সম্মুখে বাহির হয় নাই। রাখালের কোন কথাই সে বুঝিতে পারিল না। কেবল 'মা' ডাকটি তার করুণবুকে আসিয়া যেন আছাড় খাইয়া ফিরিতে লাগিল। রাখালের 'মা' ডাকে সে আর বেশীক্ষণ সাড়া না দিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সুরুচি শুনিয়াছিল— রাখালের মা জীবিত আছেন। অনুমান করিল, বোধ হয় অসুখ করিলেই মাই দেখেন, তাই রাখাল এত 'মা' 'মা' করিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছে!

রাখাল ডাকিল—মা-মা—।

রাখালের উদ্যত হাতখানা নিজের কোমল মুঠির ভিতর চাপিয়া ধরিয়া সুরুচি জবাব দিল—কাকে ডাকছ?

—মা—মা—।

কেন? কি হচ্ছে তোমার বল' না? মাই ত বসে আছে।

কেন যে সুরুচি সেরাত্রে রাখালের মায়ের আসন আঁকড়াইয়া ধরিল—তা সেই জানে। হয়ত রোগীর সান্ত্বনার জন্যই সুরুচি অমন মা সাজিয়াছিল। মনে করিলে আবার সে আসন সে ছাড়িয়া দিতে পারিত। কিন্তু নামের গুণেই হউক কিম্বা স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক মা হইবার ইচ্ছা প্রবল বলিয়াই হউক—সুরুচি আর সে আসন হইতে নামিতে চাহিল না। অবিবাহিতা সুরুচির বুকে এ আকাঙ্খা কে জাগাইল? কে তাহাকে বলিল রাখালের এত আপন হইতে—তা' কেবল জগদীশ্বরই জানেন।

রাখালের কপালের ক্ষতমুখ দিয়া তখনো রক্ত বাহির হইতেছে। সাদা ব্যাণ্ডেজের ওপর সে তার গৈরিক বিজয়পতাকা বেশ গর্ব্বের সহিত ধীরে ধীরে উড়াইতেছে। সেইখানে হাত দিয়া—রাখাল সুরুচির পানে চাহিয়া বলিল—'মা, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।'

সুরুচি অমনি মুখ নীচু করিয়া ফু দিতে লাগিল। যেন তাহারই আপন ছেলে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে—যেন তাহারই ছেলের ব্যথা দূর করিবার জন্যই তার নারীহৃদয় আজ চঞ্চল

হইয়া উঠিয়াছে। তাই সে নিজের সাধ্যমত যতটুকু পারে বুদ্ধি খাটাইয়া—রাখালের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহার সকাতর 'মা' ডাকে প্রতিবার সুরুচি জবাব দিয়া যায়—একবারও ভুলে না। রাখাল যা' দু একটা ভুল বকিতেছিল—যদিও তার সমস্ত অর্থ সুরুচির কাছে ধরা পড়িল না—কিন্তু মুল ব্যথার স্থান তাহার কাছে আর চাপা রহিল না। নিদারুণ অর্থকষ্ট—সংসারের তীব্র অশান্তি—নিজের ম্লান ভবিষ্যত—এই সকলের ওপরই রাখালের অন্তরের বেদনা অঞ্চল বিছাইয়া আছে। সেটুকু সুরুচি তার তীক্ষ্ণ নারীবুদ্ধি দিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। মা যেমন ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়; গভীর নিরাশায় বন্ধু যেমন আশা দেয়; সুরুচি রাখালের ভুল বকার মধ্যে সেইরকম তার ব্যথা—মধুর কথায় মুছাইতে লাগিল। রাখালের চোখের ধারা যেন আজ শাসন ভুলিয়াছে; রোগের যন্ত্রণায় সে যেন উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে—সুরুচি নিজের আঁচল দিয়া বার বার তাহা পুঁছাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরেই সীতানাথ বাবু বাড়ী ফিরিলেন। রাখালের বিপদ শুনিয়া—তাড়াতাড়ি ঘরে দেখিতে আসিলেন। ঘরে ঢুকিয়া—কপালের ক্ষতস্থান দেখিয়া—তিনি নিজেই চমকাইয়া উঠিলেন। বুঝিলেন এ অবস্থায় রাখালকে—কোনও মতে বাড়ীতে রাখা উচিত নয়। যদি একটা মন্দ কিছু ঘটে—তখন কে সাম্‌লাইবে। তার চেয়ে এখনি গাড়ী ডকিয়া রাখালকে বাড়ী পাঠানই ভাল।

এ লইয়া পরিবারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। রাখাল কিছুই শুনিল না বা বুঝিল না। সে পূর্ব্বের মতই সুরুচির কোলে মাথা রাখিয়া কেবলি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

চাকর গাড়ী ডাকিয়া আনিল। কোথায় যাইতে হইবে সে তা জানে না। সীতানাথ বাবু তাহাকে পথটা বাত্‌লাইয়া দিতে লাগিলেন। বাড়ী ফিরিয়া তিনি কাপড় ছাড়িবাব সময় পাইলেন না। রাখালকে আগে না পাঠাইয়া তিনি কিছুই করিতে পারিতেছেন না। তাই তাঁর এত ব্যস্ততা।

সব ঠিক হইয়া গেল। কেষ্ট চাকর রাখালকে গাড়ী করিয়া বাড়ী দিয়া আসিবে। গাড়ীর ভাড়া গোপালের কাছ হইতে চাহিয়া লইবে—এমনি মনিবের হুকুম হইল।

সীতানাথ বাবুর উপর কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। রাখাল তখনও বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। সীতানাথ বাবু চাকরকে বলিলেন—নে-না কেষ্ট, দেরী করছিস্‌ কেন? ধ'রে তোল্‌। তারপর তিনি রাখালকে ডাকিতে লাগিলেন—'রাখাল, রাখাল, গাড়ী এসেছে ওঠ—তুমি বাড়ী যাও।' রাখাল কিছুই শুনিতে পাইল না; কেষ্ট রাখালকে টানিয়া তুলিয়া বিছানায় বসাইল। রাখাল তখনো জ্বরের ধমকে টলিতেছে। সেই সময় সুরুচির মা বলিয়া উঠিলেন—'আহা, অমন অবস্থায় যেতে পারবে কি?' সীতানাথ বাবু কপাল কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিসহকারে উত্তর দিলেন,

—'পার্‌বে, পার্‌বে—খুব পার্‌বে, ও ম্যালেরিয়া জ্বরে অত ভয় নেই'।

সুরুচি তখন সীতানাথ বাবুর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—'ভয় নেই যখন—তখন আজ রাত্রে থাক্‌না—বাবা।' সীতানাথ বাবু বলিলেন—কে দেখবে? রোগীর সেবাটাত কর্‌তে হবে। তাই বলি মায়ের বাছা মায়ের কাছে যাক্‌।

সুরুচি কহিল—আমি দেখব'খন, বাবা। কোন ভয় নেই।

কথা ক'টা বলিয়াই সে যেন বাপের সম্মতি পাইয়াছে এমনি মুখাকৃতিতে দেখাইয়া রাখালকে আবার ধীরে ধীরে শো'য়াইয়া দিল।

সীতানাথ বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—না, না, সে সবের দরকার নেই, সরি। কি হতে কি হয় যদি—নে-নে কেষ্ট, ধ'রে তোল্‌।

ঠিক এমন সময় রাখাল যেন তার মায়ের কোল খুঁজিতে লাগিল। সুরুচি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের কোলের উপর তার মাথাটা যত্নে উঁচু করিয়া ধরিল। রাখাল সকাতরে বলিয়া উঠিল, উঃ—মা, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। মাথাটা যেন মোচড় খাচ্ছে। সুরুচি মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, 'ভয় নেই, মাথার যন্ত্রণা কমে যাবে'খন।'

গাড়ী ফিরিয়া গেল। সুরুচি কিছুতেই রাখালকে অমন অবস্থায় ছাড়িতে চাহিল না। রাখালকেও বেশ ধরিয়া দাঁড় করান গেল না। চেষ্টা হইল বটে দু' একবার, কিন্তু কোন ফল

হইল না। স্নুরুচির বুকখানাই যেন তাতে বেদনা পাইল। যাই হ'ক—উপায় কি, অগত্যা কাল সকালেই যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে'খন—এই আশায় সীতানাথবাবু রহিলেন; মনে কিন্তু তাঁহার উৎকণ্ঠা জাগিয়া রহিল।

তিন

—মা!

—কেন? একটু ঘুমোও না।

—মা, ছেলের উপযুক্ত কাজ কর্‌তে পারলুম না। আমাকে তার জন্যে ক্ষমা কোরো। লেখা পড়া কিছু শিখিনি। যে শিক্ষায় ছেলে মার মনে কষ্ট দিয়ে বেড়ায় সে শিক্ষা কিছুই নয়। তুমি আশীর্ব্বাদ করো মা, যেন পরজন্মে তোমার কাছে এসে আমার এই কর্ত্তব্যগুলো বেশ ভাল ভাবেই কর্‌তে পারি।

কথাগুলো সুরুচি বেশ মনোযোগের সহিত শুনিয়া যায়। রাখালদের কথা মাঝে মাঝে বাড়ীতে হইত। সুরুচি তাই রাখালের এই উক্তিগুলোর অর্থ কিছু কিছু বুঝিতে পারিল।

রাত তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে—বাড়ীর সকলেই এক রকম নিদ্রামগ্ন। সুরুচির মা মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকিয়া রাখালের খবর লইয়া যাইতেছেন। সুরুচিকে ঘুমাইবার জন্য ডাকিলে, সে—'যাই' —'যাই'—করিয়া মায়ের কথাটা কেবলি ঠেলিয়া রাখে।

সে-রাত্রে সুরুচি একে একে রোগীর সেবার যাবতীয় সরঞ্জাম বহিয়া বহিয়া সেই ঘরে আনিয়া জড় করিল। ছোট একটি স্পিরিট ল্যাম্প, এক বাটি দুধ, এক গেলাস গরম জল, ইত্যাদি

কিছুই বাকি রহিল না। একদিনেই সে মা সাজিয়া যেন বুড়ী হইয়া গিয়াছে, এমনি তার কাজে কর্ম্মে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

হঠাৎ রাখাল একটু মৃদুস্বরে বলিল—মা, তোমাকে সকল জ্বালা দিলুম। একটা জ্বালা তুমি এখনও পাওনি। সেটা আমিই তোমায় দিয়ে যাব। পুত্রশোকটা সহ্য কোরো।

কথাটা শুনিয়া সুরুচির বুকখানা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে কোন কিছু না বলিয়া এক রকম জোর করিয়াই রাখালের হাত দুখানা বুকে চাপিয়া ধরিল। হাতে পাখা লইয়া রাখালের মাথায় ধীরে ধীরে বাতাস করে—কোন ক্লান্তি নাই—কোন বিরক্তি নাই।

ইহার পর রাখাল আর বড় একটা ভুল বকিল না। এক রকম বেশ ঘুমাইতে লাগিল। সুরুচি রাখালের বুকে হাত দিয়া দেখিল—জ্বরের উত্তাপ কিছু কমিয়াছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। মনে তার একটু আনন্দও হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত রাখালকে কিছু খাওয়াইতে পারে নাই। এইবার সে রাখালের মাথাটা আস্তে আস্তে কোল হইতে নামাইয়া, স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালাইয়া দুধ গরম করিয়া আনিল। এ সব হইল খুব নিঃশব্দে, পাছে রাখালের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। দুধের বাটিটা মুখের কাছে আনিয়া খাওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিল। রাখাল তখন বেশ ঘুমাইতেছে। সুরুচিও বেশ যত্নের সহিত—যেমন ঘুমন্ত শিশুকে

দুধ খাওয়ায়—সেই রকম একটু একটু করিয়া চামচ দিয়া রাখালকে দুধটুকু খাওয়াইয়া দিল। নিজের আঁচলে মুখ মুছাইল। যাতে সে আরও খানিকক্ষণ ঘুমায়, তারির জন্য তাহার মাথায় বেশ সযত্নে হাত বুলাইতে লাগিল।

পাশের ঘরে সীতানাথবাবু ঘুমাইতেছেন। নাকের শব্দ তাঁর এঘরেও আসিতেছে। সুরুচি একবার বাহিরে গিয়া সীতানাথ বাবুর ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। তাহার যেন মনে হইতেছিল—ওই নাকের শব্দে বুঝি বা তার ছেলে জাগিয়া ওঠে।

খানিকক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর রাখাল যেমন পাশ ফিরিয়া শুইতে যাইবে অমনি তাহার ডান হাতে সুরুচির কোমল অঙ্গ ঠেকিল। সে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে? কে ব'সে—অপর্ণা—অপর্ণা?

সুরুচি কোন উত্তর দিল না। ঘর অন্ধকার—দরজার বাহিরে একটি হ্যারিকেন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহারি একটু ক্ষীণ আলো যেন অতিকষ্টে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়া রাখিলে পাছে তার আঘাতে রাখালের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়—এই আশঙ্কায় সুরুচি নিজে এই ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিল।

রাখাল আবার জিজ্ঞাসা করিল—কে—মা?

সুরুচি আর থাকিতে পারিল না—এইবার উত্তর দিল—হাঁ।

একে ঘর অন্ধকার—তাহার উপর অপরিচিত কণ্ঠস্বরে রাখাল বুঝিতে পারিল, সঙ্গিনী স্ত্রীলোক। সে কি ভাবিয়া ধড়্ মড়্ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে চায়—কিন্তু সুরুচি তাহাকে উঠিতে দিল না। এখন শোও—এখন শোও—এই বলিয়া সে রাখালকে একরকম চাপিয়াই রাখিল।

সুরুচিকে রাখাল পূর্ব্বে কোনওদিন দেখে নাই। দেখিলেও তাহার সহিত কোন কথা কহে নাই। যদিও কথা কহিয়া থাকে, কিছুই মনে নাই। রাখাল তাই একটু লজ্জিত হইল। এখন তার বেশ জ্ঞান আসিয়াছে। আগের মতন সে আর জ্বরের ধমকে কিছু ভুল বকিল না। অন্ধকারেই সুরুচির দিকে তাকাইয়া চিনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চিনিতে পারিল না। সন্ধ্যার ঘটনা সকল তাহার একে একে স্মরণ হইতে লাগিল। সেই যে পড়িয়া গিয়া কপালে চোট্ লাগিয়াছিল—সেই যে নিজের রুমাল খানা রক্তে ভিজাইয়া ফেলিয়াছিল—তাহার পর কি হইল—কপালে এ রকম ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল কে—এমন পুরু করিয়া বিছানাই বা পাতিল কে—এত গুলো রাগ্ কেন—এ সব কিছুই মনে আনিতে পারিল না।

সুরুচি মুখ নীচু করিয়া কহিল—একটু গরম দুধ দোব, খাবে?

রাখালের একবার মনে হয়, বলে—হাঁ, খাব। উদ্দেশ্য—আলোয় দেখিয়া লয়, স্ত্রীলোকটি কে। কিন্তু তার 'হা' 'না' বলার আগেই সুরুচি তাহার বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘরে আলো আনিতেই রাখাল সুরুচিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। অনূঢ়া যুবতী তাহার সেবা করিতেছে, অথচ সে তার বিন্দু বিসর্গও জানে না—বুঝিতেও পারে নাই; এই ভাবিয়া সে তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিল। চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া বেশ জ্ঞান হইল যে, সে সীতানাথবাবুর বাড়ীতেই আছে। সে-রাত্রে বাড়ী ফিরিতে পারে নাই।

সুরুচি দুধের বাটী আনিয়া মুখের কাছে ধরিল; লজ্জায় এখন আর 'খাও' কথাটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। রাখাল তখন এক দৃষ্টে সুরুচির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুযোগ বুঝিয়া সুরুচি জিজ্ঞাসা করিল, জ্বরটা কমেছে এখন? 'মা'-'মা' কর্‌ছিলে—তোমার মা কি এর চেয়েও তোমায় যত্ন কর্‌তেন? তিনি আজ কাছে থাক্‌লে এতটা যন্ত্রণা হ'ত না—না?

রাখাল আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে লাগিল—'না-না-তু-তুমি—?'

সুরুচি মুখের কথা কাড়িয়া উত্তর দিল, আমি সুরুচি। আর লজ্জা, ভয় কিসের? আমায় ত 'মা' বলেছ—নাও, দুধটা খেয়ে নাও।

দুধের বাটী রাখাল ফিরাইয়া দিতে পারিল না। যে টুকু আনিয়াছিল সবটাই খাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, মা, এখন রাত কত?

সুরুচি খালি বাটিটা মেঝের উপর রাখিতে রাখিতে বলিল, কত

আর—এই আড়াইটে বাজল। নাও, এইবার শোও,—আমি মাথায় বাতাস কর্‌ছি।

রাখাল কিছুতেই শুইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার বড় লজ্জা হইতেছে—সে এতক্ষণ আরাম করিয়া ঘুমাইয়া নিল; আর এই এতটুকু মেয়ে তাহারি সেবায় রাত কাটাইতে বসিয়াছে। উঃ—সে কি নিষ্ঠুর!

সুরুচি আবার বলিল বেশ জোর করিয়াই—শোও, ভয় নেই। বাবা বলেছেন, সকাল হ'লেই বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন।

রাখাল কহিল, আমি এখন যাই না কেন। রাস্তা থেকে একখানা গাড়ী করে নিয়ে ধীরে ধীরে যেতে পার্‌ব'খন। এখন জ্বর একেবারে না ছাড়্‌লেও অনেকটা কমেছে।

কথাটা শুনিয়াই সুরুচির মুখখানা কেমন ম্লান হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গায়ের কাপড়টা গুছাইতে গুছাইতে বলিল, বুঝিছি; আমি না গেলে শোবে না। তা শোও, আমি যাচ্ছি। এই দরজা দিলুম; বাইরেই আলোটা রইল—কোন ভয় নেই। সকাল হলে আমি এসে ডেকে দোব'খন।

এই বলিয়া সুরুচি আর দাঁড়াইল না। আলোটা হাতে লইয়া বাহির হইতেই তার কাতর দৃষ্টির উপর দরজা টানিয়া দিল। রাখাল আর কি করে—বন্দীর মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মুখে তার কোনও কথা ফুটিল না। মনে মনে ভাবিল, এ ত ঘর নয়—যেন

কারাগার। সুরুচির মাতৃস্নেহ—সেইটাই ত শৃঙ্খলের মত তার শেষ কথা গুলোর ভিতরে বেশ বাজিতেছে। কি করিবে, সব ফেলিয়া এখুনি চলিয়া আসা যায় বটে, কিন্তু এ বেড়ী কে খুলিয়া দিবে? এই যে যাইবার সময় সুরুচি ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া গেল; ওটা ত শতেক চেষ্টায় সহস্র বলেও রাখালের কাছে মুক্ত হইবে না। নারীর অন্তঃকরণ যখন মাতৃত্বের দাবী করিয়া বসে তখন পাষাণ প্রাণও তার চরণে মাথা নত না করিয়া থাকিতে পারে না। ধন্য নারীর হৃদয়!

রাখাল আর উঠিল না। আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িল। নানা চিন্তা—নানা ভাবনা—নানা আনন্দ। শুইয়া শুইয়া কেবলি ভাবে, সে কি আজ যথার্থই আর একটা মা পাইল। তাহার ভাগ্য কি এতই প্রসন্ন। সংসারের দুঃখ কষ্টে অতিষ্ঠ হইয়া সে যে তার ছাড়াছাড়ি ভাব লইয়া চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইত; আজ কি তার সে-সব চিন্তা, যন্ত্রণা ওই সুরুচির মাতৃত্বের ধারায় ভাসিয়া গেল। হইতে পারে; আশ্চর্য্য কি, নহিলে সুরুচি তাহাকে এমন সেবা করিবে কেন! তার এ অযাচিত সেবায় এমন মাতৃত্বের মুকুল ফুটিয়া উঠিবে কেন! রোগ ত অনেকের হয়, এমন আপনার ভাবিয়া রোগীকে টানিয়া লয় কয় জন? টানিয়া লয় ত এমন বুক দিয়া চাপিতে পারে কয়টা? চাপিতে পারে ত এমন স্নেহের হার গলায় পরাইয়া রাখে কতক্ষণ? এই রকম সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে রাখালের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

চার

পরদিন সকালে রাখালের মূর্ত্তি দেখিয়া সরোজিনী বলিলেন, রাখাল, তোমায় আর মাষ্টারী করতে হবে না। একটা মন্দ টেনে এনে শেষ দশায় আমায় কি জ্বালিয়ে মার্‌বে, মনে করেছ? তোমার ও টাকায় এ রাবণের সংসারে কিছুই সাহায্য হয় না। তুমি বরং বাড়ীতে থাক'। ন্যাপ্‌লাটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, ছোট লোকের ছেলেদের সঙ্গে মেশে, তাকেই পড়িও—তাকেই দেখ'—তাহলেই যথেষ্ট হবে। আমি মনে করব, আমার এক বিধবা মেয়ে আমার কাছে আছে।

কথাটা রাখালের বুকে বড়ই বাজিল। সরোজিনীর কি কষ্টে ওই কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে—তা সে অন্তরে অন্তরে বুঝিলেও কেমন রাগে, অভিমানে ফুলিতে লাগিল।

একটু পরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রাখাল বলিল—মা, আজ পয়সা উপায় ক'রে তোমার পায়ে ঢাল্‌তে পারি না ব'লে—আমি তোমার বিধবা মেয়ে হলুম। আচ্ছা—

সরোজিনী কহিলেন—তা নয় ত কি। তোমার গোঁ নিয়ে তুমি থাক'। আমাকে আর জ্বালিও না। যা বল্‌ছি—কথা শোন'। জিগেস করি—জ্বরটা এখন আছে না গেছে?

এইমাত্র রাখাল বাড়ী ঢুকিয়াছে। মাথায় তখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সকল বৃত্তান্ত সরোজিনী শুনিতেও চাহিলেন না। গোপাল সেদিন রবিবার হইলেও আফিসে যাইতেছিল ; যাইবার মুখে ভা'য়ের অবস্থা দেখিয়া মুখখানা ভার করিয়া রহিল। সংক্ষেপে রাখাল সমস্তই জানাইল। শুনিয়া গোপাল এই বলিয়া চলিয়া গেল—এখনও কত কি হবে—শুন্‌বে—দেখবে—দাঁড়াও মা, হয়েছে কি।

গোপাল চলিয়া যাইতেই রাখাল নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। সরোজিনীর কোন কথার আর উত্তর দিল না।

শনিবার রাত্রে বাড়ী না ফেরাতে রাখালের সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় আলোচনা বাড়ীতে হইয়া গিয়াছে। 'ওই বয়স—লেখাপড়া শিখে নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে আছে—ও ত উচ্ছন্ন গেল বলে'—এই বলিয়া গোপাল মাকে অনেক কথাই শুনাইয়া দিয়াছে। সেই সব শুনিয়া সরোজিনী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাই সকালে রাখাল বাড়ী আসিতেই সরোজিনীর দুঃখের বেগটা কথার ভিতর দিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িল।

তখন মধ্যাহ্ন। সংসারের কাজ এক রকম মিটিয়া গিয়াছে। সরোজিনী রাখালকে কিছু খাওয়াইবার জন্য কেবল বউমাকে তাগিদ করিতে লাগিলেন। নীলিমা যেন শুনিয়াও শোনে নাই—এমনি করিয়া বেলা বাড়াইল। সে বুঝিত—রাখাল যখন রাগিয়া আছে তখন হাজার সাধ্য সাধনা করিলেও কিছু খাইবে না। তাই

সকল কাজ শেষ করিয়া নীলিমা রাখালকে আসিয়া ডাকিল—ঠাকুর পো—ঠাকুর পো।

রাখাল উত্তর দিল—কেন ?

—এই দুধ সাগুটা খেয়ে নাও না।

—আমি এখন কিছু খাব না।

—এতখানি বেলা হ'ল—কিছুইত খাওনি।

—অনেক খেয়েছি—পেট আমার ভর্ত্তি আছে।

—তা হ'ক—যা পার'—একটু খাও। মায়ের ওপর রাগ করে আর কি হবে? দুঃখের জ্বালায় অমন কত কথাই ছেলেদের বলে।

—না—তুমি যাও। আমি বুঝি সব—আমায় বোঝাতে কিছু হবে না।

ঠিক এমন সময় নেপাল আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। সারা সকাল সে ছিপ লইয়া ওই অঞ্চলের ডোবায় ডোবায় ঘুরিয়াছে। গোটা কতক পুঁটিমাছ একটা মান পাতায় জড়াইয়া, উঠানে ফেলিয়া বলিল—বৌদি, মাছগুলো এক্ষুণি ঝাল দিয়ে বেশ চচ্চড়ি ক'রে দাও। আমি পুকুর থেকে ধাঁ করে ডুবটা দিয়ে আসছি।

রাখালের কাছে দাঁড়াইয়াই নীলিমা বলিল—এখন ও ভাই পারব না। সব রান্না হয়ে গেছে! রাত্রে ক'রে দোব'খন - খেও।

হালফ্যাসানের বাউরীকাটা চুলের ভিতর হাত চালাইয়া তেল

রগড়াইতে রগড়াইতে নেপাল কহিল—উহুঁ। এই বেলায় চাই—ই। ও বেলা ফিষ্ট আছে। পালেদের বাড়ী যাত্রা—তাতে নাচ্‌তে হবে—রাত্রে খাওয়া হবে না। তুমি যেন বড়দাকে বোলো না।

ঘর হইতে রাখাল নেপালের কথাগুলি শুনিতে পাইল। যাত্রা থিয়েটারের উপর সে ছেলেবেলা থেকেই চটা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে, ওই গুলোই ছেলেদের মাথা খাইবার যম। সে এতখানি বয়স পর্য্যন্ত তাই ওরকম কোন দলে মেশে নাই; মিশিবেও না—একথাটা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। যেমন শুনিল—নেপাল রাত্রে নাচিতে যাইবে, অমনি ধড়্ মড়্ করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। নামিবার উপক্রম করিতেছে-এমন সময় নীলিমা ধরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ঠাকুরপো, কোথায় যাচ্ছ?

রাখাল উত্তর দিল—বাইরে।

নীলিমা বুঝিতে পারিয়াছে, বাহিরে যাইবার উদ্দেশ্যটা কি। তাই সে নিষেধ করিয়া বলিল—না, তুমি শোও—বাইরে যেতে হবে না। ছোট্‌ঠাকুরপোর কথা ছেড়ে দাও।

রাখাল কোন কথা শুনিল না। নীলিমাকে বাঁহাতে ঠেলিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। চক্ষু তাহার রক্তবর্ণ—সর্ব্বশরীর ক্রোধে কম্পমান।

নেপালকে ডাকিয়া বলিল—নেপাল, শুনে যা।

নেপাল তেল মাখিতে মাখিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

—সকাল থেকে তুই কোথায় ছিলি?

নেপাল কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া উত্তর দিল—বৌদি বল্‌লে, মাছ নেই। তাই মাছ ধর্‌তে গেছ্‌লুম।

কোন কথা নাই। রাখাল সটাং করিয়া তাহার গালে এক চড় কসাইল। টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া নেপাল তিন চার হাত দূরে গিয়া বসিয়া পড়িল।

—রাস্‌কেল কোথাকার! মাছ ধর্‌তে গেছ্‌লে ছোট লোকদের সঙ্গে?

নীলিমা ভয় পাইয়া দুজনকে ছাড়াইবার জন্য তা'দের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইয়া রাখালকে বলিল, কি কর্‌ছ ঠাকুরপো, তোমার না অসুখ শরীর? ঘরে চল—ঘরে চল!

রাখাল উত্তেজিত হইয়া কহিল, না, আমি ঘরে যাব না। তুমি স'রে যাও। আমি আজই নেপ্‌লার বিহিত কর্‌ছি।

নেপালের চোখে জল নাই। তার এ সব সহ্য আছে। ডানপিটে, গোঁয়ার—যতদূর হবার সে ততদূর। গালে তাহার রাখালের চার আঙুলের দাগ পড়িয়াছে। রাখালের মুখের ওপর এতক্ষণ সে কোন কথা বলে নাই। কিন্তু যখন দেখিল, রাখাল তাহার সাধের পুঁটিমাছগুলো পা দিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল,

তখন সে আহত ব্যাঘ্রের মতই গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল, বেশ করিছি মাছ ধর্‌তে গেছি। তোমার কি? তোমার পুকুরে ছিপ ফেলেছি? তুমি কেন মাছ ফেলে দেবে? ওঃ—ভারি দাদাগিরি ফলাচ্ছে। বেশ কর্‌ব—আরও ধর্‌ব।

এই বলিয়া সে তেলের বাটীটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ছিপগাছটা আবার হাতে লইয়া যেমন বাহির হইয়া যাইবে রাখাল শাসাইল, দেখ্‌ নেপাল, মেজাজ ঠিক নেই। এখুনি খুন করে ফেল্‌ব বল্‌ছি।

নীলিমা উপায়ান্তর না দেখিয়া 'মা', 'মা', 'ঠাকুরঝি', 'ঠাকুরঝি' করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। সরোজিনী ও অপর্ণা উপর হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন। মাকে দেখিয়া রাখাল নেপালকে শাসন করিবার জন্য আরো উত্তেজিত হইয়া তাহার হাতের ছিপগাছটা বাঁ হাতে ধরিয়া ফেলিল—ভাঙ্গিয়া দেয় আর কি।

নেপাল কহিল, মেজদা, আমার ছিপ ভেঙ, না বলছি—ভাল হবেনা কিন্তু।

নেপাল যখন দেখিল তাহার কথায় রাখাল ভয় খাইল না, উপরন্তু ছিপগাছটা তাহার সত্য সত্যই ভাঙ্গিয়া দিল; তখন সে রাখালের কপালের ক্ষতস্থানে সজোরে এক ঘুসি মারিল।

'ওঃ—বাবারে'—বলিয়া রাখাল কপালে হাত দিয়া একেবারে বসিয়া পড়িল।

নেপাল সেদিকে তাকাইল না। বীর বিক্রমে ভাঙা ছিপগাছটা বন্দুকের মত কাঁধে ফেলিয়া, 'ঠিক হয়েছে—আমার সঙ্গে ওস্তাদি—ছিপ ভেঙে দেওয়া'—এই বলিয়াই সগর্ব্বে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রস্থান করিল।

সারাদিন নেপাল বাড়ী ফিরিল না। যাত্রাদলেই একরকম স্নানাহার সারিয়া লইল। রাত্রে গোপাল আফিস হইতে বাড়ী আসিলে সরোজিনী আর থাকিতে পারিলেন না, সমস্ত ব্যাপারটা গোপালকে জানাইলেন। গোপাল জোর গলায় জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় নেপাল ? নেপাল !

নীলিমা এ সব ভাল বাসে না। একটু চেঁচামেঁচি শুনিলেই তার বুক কাঁপিয়া ওঠে। তাই সে বাধা দিয়া বলিল—নেপাল বাড়ী নেই। পালেদের বাড়ী যাত্রা শুন্‌তে গেছে। আমায় বলেই গেছে। যাক বাবু যাক—যার যা মন চায় করুক। আমি ও সব ভায়ে ভায়ে মারামারি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারিনা। আমার কেমন গা হাত থর্ থর্ করে কাঁপে—বড় ভয় করে। দুপুর বেলায় যা কাণ্ড সব ! কারে ধরি—আমি যেন থ হয়ে গেছলুম।

গোপালের সমস্ত রাগটা আসিয়া পড়িল রাখালের উপর। উপর হইতে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, তোর কি দরকার ? তুই যখন কিছু দেখিস্‌না, তখন তোর অত মাথা গরম কর্‌বার কি প্রয়োজন ? নেপাল ব'য়ে যাক্—উচ্ছন্ন যাক্—আমি বুঝ্‌ব। তুই তোর নিজের সাম্‌লা। এই ত কাল রাত্রে কোথায় ঢলাঢলি ক'রে

মাথা ফাটিয়ে এলি। আমি কি কিছু বুঝতে পারি না। এতই বোকা মনে করিস্? না হয় তোর মত এম, এ পাশ করতে পারি নি; তা বলে আমার চোখে ধূলো দিয়ে বেড়াবি তুই—এ কখনও স্বপ্নে ভাবিস্ নি।

নীলিমা এ চীৎকারে ভয় পাইয়া বলিল—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি থাম। এই দুপুরে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। আবার এই রাতে তুমি এসে আর এক কাণ্ড বাঁধাবে না কি? ঠাকুরপো আজ খুব জ্বর। জ্বরের ওপর জ্বর এসেছে। কপালটা এই ফুলে উঠেছে। যাও—ওঠ, কাপড় ছেড়ে দুটো খেয়ে ঠাণ্ডা হও।

তারপরই সব ধীরে ধীরে কথা আরম্ভ হইল। সকলের ভাবনা—রাখালের কি হইবে। নেপালের জন্য অত চিন্তা নাই। সন্ধ্যা হইতে রাখালের জ্বর কমিয়াছে। গোপাল বাড়ী ফিরিয়াছে, তাও সে জানিয়াছে। তাহাকে শুনাইয়াই হ'ক—আর না শুনাইয়াই হ'ক—এই যে কথাগুলো এইমাত্র গোপাল চেঁচাইয়া বলিল, তাহা রাখাল সব শুনিয়াছে। একবার মনে করিল, উপরে যায়। গিয়া সে খুলিয়াই বলে, ওগো—তোমরা যা সন্দেহ করছ—আমি এখনো অতটা উচ্ছন্ন যাই নি। কিন্তু কি ভাবিয়া গেল না। এখন তার মাথার ঠিক নাই। হয়তো রাগের ঝোঁকে কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে পরে আপশোষের অন্ত থাকিবে না। মনে মনে ঠিক করিল, আর সে এখানে থাকিবে না। কাহাকে কোন কথাও বলিবে না

যেদিকে হ'ক একদিকে চলিয়া যাইবে। তাহার পয়সা নাই বলিয়া তাহাকে আজ এত কথা শুনিতে হইতেছে। আজ যদি সে বড় ভা'য়ের মত গোলামী করিয়া পয়সা আনিয়া সংসারে ঢালিতে পারিত, তাহা হইলে এত কথা উঠিত না। সে আজ বিধব মেয়ে সাজিয়া বসিত না। সে কি এ-সংসারে ভারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে? তাহার এই ছন্নছাড়া জীবনটাকে একটা বিয়ে থা দিয়ে সংসারের থামে জড়িয়ে বেঁধে দিন দিন অভাব অভিযোগের চাবুক কশাইতে পারিলেই কি—মা, ভাই ঠাণ্ডা হয়? নাঃ—আর নয়; যদি কখনও তার পয়সা হয়—যদি কখনো সে উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারে, তাহা হইলে তখন সে মার কাছে ফিরিয়া আসিবে, মার দুঃখ দৈন্য ঘুচাইবে, ভাই বোন সকলকে দেখিবে। বাপের উপর বড় ভায়ের উপর তার রাগ হইল। কেন তাহাকে এত পয়সা খরচ করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছে? যদি এই তাদের ধারণা ছিল যে, রাখাল লেখাপড়া শিখিয়া পয়সা আনিবে—কেরাণী সাজিবে; কেন তারা তাকে স্কুল কলেজে ঢুকাইয়াছিল? তাহার চেয়ে ওই বাজারে আলু পটল লইয়া বেচিতে শেখায় নাই কেন? কেন ওই বিড়ীওলার মত কেমন করিয়া পাতা কাটিয়া ছাঁটিয়া বিড়ী পাকাইতে হয় তাহা রপ্ত করায় নাই। তাহা হইলে আজ তাহাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।

নিজের কপালে হাত দিয়া রাখাল দেখিল, কপালটা তখনও

বেশ ফুলিয়া রহিয়াছে। এমন অবস্থায় যায় বা কোথায়—কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। হঠাৎ সুরুচির কথা মনে পড়িল। অজানিতে দু' ফোঁটা চোখের জল কখন যে গড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

নেপাল অত রাত্রে চুপি চুপি—পা টিপিয়া আসিয়া—আস্তে আস্তে ডাকিল—বৌদি, বৌদি।

প্রথম ডাকেই রাখাল বুঝিতে পারিল, নেপালের নাচ শেষ হইয়াছে। এইবার সে বাড়ী ঢুকিতে চায়। কিন্তু নেপালের ওপর তাহার আজ ঘৃণা অত্যধিক। তাই সে তাহার ডাক শুনিয়াও উঠিল না।

আরও খানিকক্ষণ নেপাল ডাকিল। নীলিমা শুনিতে পায় নাই। যখন শুনিতে পাইল—তখন তাড়াতাড়ি অন্ধকারেই নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

বলিল—হ'ল নাচ? পায়ে ঘুঙুরের দাগ পড়েনি ত?

নেপাল কহিল—নাও, নাও, ঠাট্টা রাখ। মেজদা কেমন আছে?

—আর মেজদার খবর তোমায় নিতে হবে না—যেমনই থাকুক। তুমি বাড়ী আস্‌বে ত এস, নইলে আমি দরজা বন্ধ করে দোব।

—দেখ বৌদি, এখনো আমাদের যাত্রা শেষ হয় নি। আমি এখন বাড়ী ঢুকব না। কাল বড়দা আফিস চলে গেলে তারপর আসব।

—না ভাই, তোমার বড়দা আজ খুব রেগে গেছে। তোমায় সকালে না দেখ্‌তে পেলে ভীষণ কাণ্ড কর্‌বে। তুমি এইবেলা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।

—আচ্ছা—ভোর বেলায় আস্‌ব। এখন এই ধর' দেখি শিশিটা। এইটেতে ওষুধ আছে। আমাদের যাত্রাদলের কাছে সর্ব্বদাই থাকে। যদি কোথাও চোট্‌ টোট্‌ লাগে সেইখানে লাগিয়ে দিলে ব্যথা মরে যায়। আমি শুনে খানিকটা একটা ছোট শিশিতে ঢেলে তোমায় দিতে এলুম। মেজদার কপালে বেশ করে লাগিয়ে দিও। দেখো যেন খেয়ে ফেলো না। হ্যাঁ বৌদি, মেজদার বেশী লাগে নি ত?

—বেশী লেগেছে কি কম লেগেছে—আমি কি করে জান্‌ব। তুমি জিজ্ঞেস ক'রে জানগে যাও। এই ভ্রাতৃভক্তিটা দুপুরবেলা দেখাতে কি হয়েছিল?

নেপাল আর দাঁড়াইল না। নীলিমার হাতে শিশিটা দিয়া যেমন অন্ধকারে ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। রাখাল পাশের ঘরে শুইয়া শুইয়া সমস্তই কান খাড়া করিয়া শুনিল; কিন্তু ভা'য়ের এত রাত্রে ভক্তি, ভালবাসা ফুটিয়াছে—এটা জানিয়াও কিছুমাত্র আনন্দিত হইল না।

পাঁচ

আজ আট ন' দিন হইল রাখাল বাড়ী যায় নাই। কাহাকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। কোথায় আছে, কেমন আছে—কি করিতেছে—এ সম্বন্ধে একখানা পত্রও বাড়ীতে লেখে নাই। সরোজিনী ভাবিয়া আকুল। লেখাপড়া শিখে ছেলেটা এমন হয়ে গেল—এই চিন্তাটাই সরোজিনীর বুকে বড় ব্যথা দিত। গোপাল অনেক বুঝায়। কিন্তু সে বুঝান কিছু কাজে লাগিত না। মাতৃ-হৃদয় অন্তরেই কাঁদিত।

রাখাল এদিকে সহরে আসিয়া যেমন ছেলে পড়াইত তেমনি পড়াইয়া যায়। কোন গতিকে রাতটা বন্ধুদের ক্লাবরুমে কাটাইয়া দিত। রাখাল সুবোধকে পড়াইতে আসিলে, সুরুচি নিজে আসিয়া রাখাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে। তাহার এরূপ স্নেহ, মায়া দেখিয়া বাড়ীর সকলে নানারূপ ঠাট্টা করিত। সুরুচি তাহাতে কান দিত না। কেবল তার মুখে এক কথা—'ও যে আমায় 'মা' বলেছে—ও ত আমার ছেলে।

সুরুচি মেয়ে-স্কুলে পড়িয়াছিল। মোটা মুটি লেখাপড়া একরকম সে শিখিয়াছে। বয়স্থা হইয়াছে বলিয়াই ইদানীং আর স্কুলে যায় না।

বাড়ীতেই দু' একখানা বই সুবিধা মত পড়িয়া ফেলে। তাহার এ-রকম বুদ্ধি দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। তার উপর সুরুচি হ'বার পর হইতেই সীতানাথবাবু ব্যবসায় খুব উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মেয়েকে তিনি খুবই ভালবাসিতেন। তাহার কোন আশা তিনি অপূর্ণ রাখিতেন না।

রাখালও সুরুচিকে 'মা' বলিয়া যেন সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। যে-দিন না সুরুচির দেখা পাইত, সেদিন সুবোধকে দিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া দুটো কথা কহিয়া যাইত। বাড়ীতে যে না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে—নানা দুঃখে কোন খোঁজ খবর দেয় নাই—এসব সুরুচিকে এক এক সময় তার বলিবার ইচ্ছা হইত; কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিত না।

রাখালকে আর বড় কেহ মাষ্টার মশাই বলিয়া ডাকিত না। সকলেই তাহাকে সুরুচির ছেলে বলিয়া ডাকিত। রাখালের সম্মুখে আসা যাওয়ায় সুরুচির একটু যা বাধ-বাধ ভাব ছিল, তাও শেষে রহিল না। এ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে সুরুচি বেশ হাসিয়াই জোরের সহিত জবাব দিত, ছেলের কাছে আবার লজ্জা কিসের।

একদিন রবিবার সকালে গোপাল সীতানাথবাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে রাখালের খবর সমস্তই পাইল। পাইল না কেবল এইটা জানিতে—সে কোথায় থাকে, কোথায়

খায়। যাহা হউক অনেক কথাবার্ত্তার পর গোপাল এই স্থির করিয়া গেল যে, অতঃপর রাখাল সীতানাথ বাবুর বাড়ীতেই থাকিবে। তাঁহার ছেলেকে যেমন পড়াইতেছে তেমনি পড়াইবে। তার জন্য সীতানাথবাবুকে পূর্ব্বের মত কিছু দিতে হইবে না। কেবলমাত্র ভা'য়ের উপর একটু দৃষ্টি রাখিবেন। খাওয়া দাওয়া সবি তাঁরি বাড়ীতে করিবে। সীতানাথবাবু এ পরামর্শে রাজী হইলেন। তিনিও এটা অনেক দিন হইতে ভাবিতেছিলেন; কিন্তু সাহস করিয়া রাখালকে বলিতে পারেন নাই।

রাখাল সন্ধ্যার পর পড়াইতে আসিলে সীতানাথবাবু কথাটা পাড়িলেন। রাখাল রাজী হইল না। কেমন ছাড়াছাড়া উত্তর দিতে লাগিল। সীতানাথবাবু দেখিলেন—তাঁহার দ্বারা হইবে না। তাই তাঁর মেয়েকে দিয়া বলাইলেন। তিনিও জানেন সুরুচি রাখালের মা হইয়াছে। মার কথা নিশ্চয়ই ঠেলিতে পারিবে না। সুরুচি সকল শুনিয়া রাখালকে ধরিয়া বসিল—তাহাদের বাড়ীতে থাকিতেই হইবে। তাহারা আর পর নয়। সুরুচিকে যখন 'মা' বলিয়াছে তখন তাহার কথা শুনিতেই হইবে। মায়ের কাছে ছেলে থাকিবে এতে আর লজ্জা কিসের। এমন ত অনেক মাষ্টার কল্‌কাতার সহরে আছে। তা ছাড়া সে যে এই ক'দিন ধরিয়া তার নতুনমার চোখে ধূলি দিয়া হোটেলে খাইয়া বেড়াইয়াছে—এজন্য রাখালকে সুরুচি সস্নেহ তিরস্কার করিতেও ভুলিল না। রাখাল

আর অমত করিতে পারিল না। সুরুচির মতেই মত দিল। স্নেহ ও ভালবাসার জয় সর্ব্বত্রই।

রাখালের জন্য নীচের এক খানা ঘর ছাড়িয়া দিয়াছে। সুরুচি ঘরখানি বেশ গুছাইয়া দিল। রাখালের বই পড়ার নেশা খুব। রাখাল একদিন বাড়ী গিয়া তাহার দরকারী বইগুলো লইয়া আসিল। সুরুচি তাহা ঝাড়িয়া পুঁছিয়া বেশ যত্নের সহিত সাজাইয়া রাখিল। সুরুচির আগ্রহ দেখিয়া তাহার বাপ মা বলা বলি করিতেন—মেয়ে না বিইয়ে কানাইয়ের মা হইয়াছে।

রাখালের কিছুরই ত্রুটি হইল না একা সুরুচিই তার মায়ের আসনে বসিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিল। সময়ে চা—সময়ে জলখাবার—সময়ে আহার—সবি সময়ে। একদিন যদি একটু বিলম্ব হয় ত সুরুচি রাগিয়া আগুন হইয়া যায়। তার রোগা ছেলের জন্য সে যেন অস্থির হইয়া পড়ে। কাজে কাজেই সকলে তাহার কাজ আগে সারিয়া রাখে।

রাখাল মাঝে মাঝে বাড়ীতে যাইত বটে, কিন্তু বেশীদিন সেখানে থাকিত না। তার প্রতিজ্ঞা—আগে টাকা তারপর বাড়ীতে বাস—এ কথাটা সে ভোলে নাই। বাহিরে কেহ তার এ প্রতিজ্ঞার কথা জানিত না। অন্তরের পণ সে অন্তরেই চাপিয়া রাখিয়াছিল। মনোমত একটা ভাল কাজের জন্য সে ভিতর ভিতর চেষ্টাও করিতে লাগিল।

সরোজিনী রাখালের প্রায়ই খবর পাইতেন। সীতানাথবাবুর এই বদান্যতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতেন। রাখালের স্বভাব জানিতেন বলিয়া তার স্বাধীনতায় আর আঘাত করিতেন না। ছেলে শিক্ষিত—যা ভাল বোঝে করিবে ; ইচ্ছা হয় সংসারধর্ম্ম করিতে, ও আপনিই তা দেখিয়া শুনিয়া করিবে। জোরের কাজ নয়। সরোজিনী এটা শেষে বুঝিয়াছিলেন।

রাখালের ম্যালেরিয়া তখনও সারে নাই। মাঝে মাঝে রাখালের সর্ব্বশরীর নাড়া দিয়া জানাইত—আমি আছি।

বন্ধু বান্ধবের সহিত মেলামেশা তার খুবই ছিল। ক্লাবরুমে প্রায়ই আসিয়া গল্প গুজবে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটাইয়া যাইত। তাদের আসর জমিলে সহজে ভাঙ্গিত না। একদিন রাখাল ক্লাবে শুইয়া আছে, বন্ধুরা আসিয়া তাহার ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিতে বসিল। অবশেষে সকলে একবাক্যে জানাইল যে, রাখাল ত সব চেষ্টাই করিয়াছে। এইবার তাহাদের মতে চলিলে একমাসে তার ম্যালেরিয়া রোগ সারিয়া যাইবে।

রাখাল তাহা শুনিয়া আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল—কি ?

বন্ধুরা বলিল—তেমন কিছু নয়। রাত্রে শোবার আগেই একটু একটু ক'রে যদি মদ খেতে পার, গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে—বাস্, আর দেখ্তে হবে না। ম্যালেরিয়া তোমার দেশ ছেড়ে পালাবে।

কেহ কেহ কহিল—দিন কতক করেই দেখ' না। এ ত আর নেশা কর্‌ছ না। ওষুধের জন্যে ওসব চলে।

আবার কেহ কেহ সতর্ক করিয়া দিল—দেখ' ভাই, যেন মাত্রা বাড়িয়ে বাড়িয়ে চ'লো না। তাহলে তোমায় খুঁজে পাওয়া দায় হবে। একটু রেগুলেট করে চল্‌লেই—বিষও সুধার কাজ করে, তা জান ত?

পরামর্শটা রাখালের মাথায় কেমন ঢুকিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল—সকল রকম ব্যবস্থাই ত করেছি। এটাও দেখিনা দিনকতক কি হয়। শরীরের জন্যে একটু একটু খাওয়া চলে। এতে দোষ নেই। অনেক বড় বড় ডাক্তাররাও ত একথা বলে থাকেন।

সেইদিনই—আর দেরী করিল না—বাড়ী ফিরিবার সময় রাখাল ডাক্তারখানা হইতে এক বোতল বিলাতী মদ কিনিয়া ফেলিল। পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে সে বোতলটা বেশ ভাল করিয়া কাগজে জড়াইয়া নিল। প্রতিদিন রাত্রে শুইবার আগে সুরুচি একবাটী গরম দুধ দিয়া যায়। রাখাল চুপি চুপি তাহার সহিত মিশাইয়া মিশাইয়া দিনকতক বেশ খাইতে লাগিল। কেহ টের পাইল না।

সুরুচি ইদানীং বড় একটা রাখালকে কাছছাড়া করিত না। বন্ধু বান্ধবের কাছে যাইতে চাহিলে, শীঘ্র ফিরিব, না বলিলে ছাড়িয়া

দিত না। সুরুচির কেমন ভাল ভাল ইংরাজী বই হইতে গল্প শুনিবার বড় নেশা চাপিয়াছে। সে স্কুলে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু এতদূর পড়ে নাই যে, ইংরাজী বই পড়িয়া গল্প বুঝিতে পারিবে। মেয়ে-স্কুলের পড়া—ফার্ষ্ট বুকখানা কোনওগতিকে শেষ করিয়া দিয়াছে; তাহাতে কি আর ইংরাজী সাহিত্যের রস পান করা চলে? বাঙলা গল্প, রামায়ণ—মহাভারত—পুরাণের উপাখ্যান সে শুনিতে চাহিত না। সে অবসর মত সেগুলো নিজেই পড়িয়া লইত। রাখাল তাই আগের মতন বন্ধু বান্ধবের সহিত মিশিতে পারিত না। সুরুচিকে গল্প বলিতে হইবে—এজন্য তাহাকে রীতিমত পড়া সুরু করিতে হইল। গল্প যে সুরুচি একা শুনিত তা নয়, বাড়ীর আরো দুটি ছোট ছোট মেয়ে আছে—তারাও আসিয়া শুনিতে বসিত। এক এক দিন আবার সুবোধ স্কুল হইতে ছুটিরপর আসিয়াই তাহাদের দলে বসিয়া পড়িত।

এতটা মেলামেশা রাখালের বন্ধু বান্ধবেরা পছন্দ করিল না। তারা রাখালের উপর একটু অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। রাখালের সীতানাথবাবুর বাড়ীতে থাকার উদ্দেশ্য কি—কেন সে আর পূর্ব্বের মত তাদের ক্লাবে আসিতে পারে না—কাহার জন্য সে এমন করিতেছে—এই সব লইয়া অপ্রিয় আলোচনা—রাখালের অবর্ত্তমানে তাহাদের দলের মধ্যে হইতে লাগিল। যদি কোনওদিন রাখাল আসিয়া পড়িত—তাহা হইলে তাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে

দু' একটা কথা যে না শুনিতে হইত, তা নয়। রাখাল কিন্তু তাতে তত মনোযোগ দিত না। সরল হাসির স্রোতে সে সব ভাসাইয়া চলিতে লাগিল।

রাখালের বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই সুধীরের বাড়ীতে আসিয়া বসে। সুধীরের বাড়ীতেই ছিল তাহাদের ক্লাবরুম। অন্দরমহলের সহিত ক্লাবরুমের কোন সম্বন্ধ নাই। তাস, দাবা, পাশা, গান-বাজনা সবই চলিত। মাঝে মাঝে তাদের হাসির অট্টরোলে পাড়া মুখরিত হইলেও কোন প্রতিবাসী বিরক্তি প্রকাশ করিত না।

সীতানাথবাবুর সহিত সুধীরের বিশেষ আলাপ না থাকিলেও—রাস্তায় দেখা হইলে উভয়েই উভয়কে হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া পরিচয়টা বজায় রাখিত। রাখালের সম্বন্ধে কোন কথা সুধীর সীতানাথবাবুকে বলিত না। সে জানিত—রাখাল বুঝ্‌দার, সে যদি নিজে না বুঝিতে চায়, তাহা হইলে সীতানাথবাবুকে দিয়া বুঝান বৃথা।

এদিকে রাখাল মদের মাত্রা বেশ বাড়াইয়া চলিয়াছে। ভাল লাগে বলিয়াই হউক আর মনটাকে একটু হাল্কা রাখে বলিয়াই হউক—সে ধীরে ধীরে বোতলের শাঁসটা বেশ জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। এর উপর যেদিন বন্ধুদের ঠাট্টা তামাসার মধ্যে নিজের সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনা শুনিয়া আসিত—সে দিনের ত কথাই নাই। পয়সার অভাব হইত না। সকালে আজকাল আর একটা

নূতন মাষ্টারী জুটাইয়াছে, তাহাতে মাসটা কাটিলে কিছু মোটা রকমের পায়। বাড়ীতেও কয়েকজন ছাত্র পড়িতে আসে, তাহারাও যে কিছু না দিত, তা নয়।

সুরুচি রাখালকে নাম ধরিয়া আর ডাকিত না—'ছেলে' বলিয়াই ডাকিত। সে তাহার ছাত্র পড়ান দেখিয়া প্রায়ই বলিত, ছেলে, এইবার একটা টোল খুলে ফেল। পণ্ডিতী কর্‌তে তুমি বেশ পারবে।

রাখাল হাসিয়া উত্তর দিত, এইবার খুল্‌ব, মা। তোমার কাছ থেকে আরও একটু শিখে নিই—আমার ত নিজস্ব কিছু মাথায় নেই।

রাখাল মনে করিয়াছিল, বন্ধু বান্ধবেরা এই রকম বলিতে বলিতে আপনিই থামিয়া যাইবে। সেজন্য সে আর তাহাদের কথায় প্রতিবাদ করিত না। কিন্তু অন্তরে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। ক্লাবরুমে যাইতে তাহার মন আর চাহিত না। সন্ধ্যার পর একা নিজের ঘরেই বসিয়া থাকিত।

ওদিকে বন্ধু বান্ধবেরা পরামর্শ করিতে লাগিল,—রাখালকে কেমন করিয়া ও বাড়ী হইতে বাহির করিয়া আনিবে। আর বেশী বিলম্ব করিলে চলিবে না। নিশ্চয়ই রাখাল শেষে এক কেলেঙ্কারী করিয়া বসিবে। খবর লইয়াছে, সীতানাথবাবুর উপযুক্ত মেয়ের এখনও বিবাহ হয় নাই। রাখাল সর্ব্বদাই তাহার

সহিত গল্প করে। রাখাল মোহে পড়িয়াছে। উচ্চশিক্ষার অবমাননা করিতে বসিয়াছে। গেল সব—গেল সমাজ ; রাখাল মুখ পোড়াইলে তাহার একার পুড়িবে না, তাহাদেরও মুখ পুড়িবে।

বঙ্কু সুধীরকে বলিল, দেখ' সুধীর, ও রাখালকে বলে আর কিছু হবে না। দেখ্‌ছ ত, সে আর বড় একটা ক্লাবে আসে না। আমাদের বেশ এড়িয়ে চল্‌তে চায়। তোমার সঙ্গে সীতানাথবাবুর আলাপ আছে, তুমিই তাঁকে একবার ভেতরের ব্যাপারটা জানিয়ে দাও। তিনি নিশ্চয় আর এসব শুনে চুপ করে থাক্‌তে পার্‌বেন না। যা হয় একটা কিছু করবেন।

সুধীর কহিল, শেষে তাই কর্‌তে হবে দেখ্‌ছি। আমাকেই লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে কথাটা একদিন তাঁর কাছে পাড়্‌তে হবে। একটু সাবধান করে দেওয়া ভাল। তাতে তিনি শোনেন— ভালই ; নইলে আমরা আর কি কর্‌তে পারি !

বঙ্কু ঘাড় নাড়িয়া হাত চাপড়াইয়া জানাইল, রাখাল শিক্ষিত হইলে কি হইবে ; রাখালের সাধারণ জ্ঞান কিছুই নাই।

সেদিন রাত্রে ক্লাবরুমে এই রকম কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় রাখাল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাখালকে দেখিয়া কেহ আর কিছু বলিল না। রাখাল বসিলে, সকলের মুখের পানে একবার তাকাইয়া সুধীরই কথাটা পাড়িল, দেখ' রাখাল, এঘরে আমাদের বন্ধু বান্ধব ছাড়া আর অন্য কেউ নেই। তোমারও কিছু

লুকোবার প্রয়োজন নেই। আমরা আজ তোমাকে গোটাকতক কথা বল্‌ব। সেগুলো বলাও আমাদের উচিত। কি বল, ভাই ?

হরেন পাশেই বসিয়া ছিল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—নিশ্চয়ই।

সুধীর একটু জোর পাইয়া আবার বলিল—আচ্ছা রাখাল, এটা তুমি মান কি না—আগুনের কাছে থাক্‌লে গায়ে তাত লাগে —শেষে ফোস্কাও পড়ে !

রাখাল হাসিয়া কহিল—খুব মানি।

সুধীর বলিল—দেখ,' মেয়েছেলেদের যৌবন বয়সটা যা তা মনে ক'রো না। আমি অবশ্য তোমাকে বোঝাতে চাই না কেননা তুমি আমার চেয়ে ঢের শিক্ষিত—বোঝও ঢের বেশী।

শম্ভু তাসের প্যাকেটটা লইয়া এহাত ওহাত করিতেছিল। সে বাধা দিয়া কহিল, দেখ' হাতিরও পা টলে।

সুধীর বেশ বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া চাদরের উপর আঙ্গুল টানিয়া টানিয়া বুঝাইতে লাগিল, যাক—ছেড়ে দাও ও কথা। আমি স্বীকার কর্‌লুম তুমি খুব ভালো। তোমার দ্বারা ওদের কোন অনিষ্ট বা ক্ষতি হবে না। কিন্তু ধর, আজ যদি ওই মেয়েটার বিয়ে নিয়ে গোলমাল বাধে আর তুমিই যদি তার মূলে দাঁড়াও, তা হলে কি হবে ?

রাখাল কথাটা শুনিয়া সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে আশঙ্কা করিতে লাগিল, এমনও হইতে পারে না কি।

শম্ভু বলিল—সত্য কথা বল্‌তে কি, তুমি রাগ কোরো না। আমরা বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি, তুমি ভীষণ মোহে পড়েছ। এখনও পথ আছে ভাই—বেরিয়ে এস। কেন শেষে একটা—

সুধীর শম্ভুর কথা শেষ না হইতেই কহিল—তারপর আর একটা কি জান? আমাদের একটা কথায় বলে, 'পরভাতি ভাল ত পরঘরী ভাল নয়'—বুঝ্‌লে—কথাটা বেশ তলিয়ে বোঝ। তোমার নিজের বাড়ী ঘর থাকৃতে মা-ভাই-বোন থাকৃতে কেন তুমি পরের বাড়ী থাকৃতে যাবে? তোমার কি সেটা বিবেকে ঘা দেয় না?

ইহা শুনিয়া রাখালের মুখ ক্রমশঃই বিবর্ণ হইয়া ওঠে। মনে তার এই কথাগুলো কেবল তোলাপাড়া করিতে লাগিল, ওরা পর। সুরুচি পর। যে একদিন আমায় আপন মায়ের মত সেবা যত্ন করেছিল; নিজের সুখের দিকে যে সে-রাত্রে ফিরেও তাকায় নি; আজ পর্য্যন্ত যে আমার ওপর পেটে-না-ধরেও অফুরন্ত মাতৃস্নেহ ঢেলে দিয়ে আস্‌ছে—তাকে আমি পর ভাব্‌ব—সে স্ত্রীলোক বলে, সে অনূঢ়া বলে। তার যৌবন আছে বলে আমি আজ তাকে 'মা' বলে ডেকে যেতেও পার্‌ব না। বন্ধুরা ঠিকই বলেছে আমার আর ওখানে থাকা হবে না। এদের সন্দেহ দূর হবে না; ক্রমে আরও বেড়ে যাবে। শাখা প্রশাখা লয়ে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়্‌বে। তারপর সুরুচির বিয়ের কথা—সেটাও ভাবৃতে হবে বই কি। যদি এমন ঘটে—। বসিয়া বসিয়া রাখাল এমনি অনেক

ভাবিতে লাগিল। বন্ধুরা সকলেই একে একে সৎ পরামর্শ দিয়া যায়। উপদেশ দানে কেহ কার্পণ্য করে না। তারপর মজ্‌লিশ ভাঙিয়া গেল। একে একে সবাই উঠিয়া পড়িল। রাতও হইয়াছে অনেক। সবশেষে রাখাল উঠিলে সুধীর কহিল—তুমি অমন ম্লান হয়ে গেলে কেন? এ ত ভাল কথাই।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, আমার এ কুৎসাটা তোমাদের মধ্যে এতই দৃঢ় হয়ে গেছে?

সুধীর বলিল—হাঁ। আরও যা সব শুনেছি—সব তোমায় বল্‌তে পারব্‌ না। তুমি নিজে বিয়ে কর'—আমার কথা শোন। আমি সমস্ত সেদিন তোমায় খুলে বল্‌ব।

রাখাল আবার জিজ্ঞাসা করিল, কি আরো কথা?

সুধীর গম্ভীর হইয়া বলিল—আছে,আছে, তোমায় দোষ দিই না—তোমায় কেবল সাবধান হতে বলি। মানুষের স্বভাবই ওই। থাকৃতে পারে না—থাকা অসম্ভব। তুমি কবে সীতানাথবাবুর মেয়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে গল্প বল্‌ছিলে—সে খবরটা আমরা পেয়েছি। বঙ্কু তোমাকে ডাকৃতে গিয়ে বাইরে থেকে উঁকি মেরে ওই দেখে চলে আসে—আর ডাকে নি।

রাখাল একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—তাহা মিথ্যে। আমি কখনও তার গায়ে হাত দিই না। আমার সে জ্ঞান আছে। বঙ্কু বাড়িয়ে বলেছে। ওদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি

বলে কি এতই খারাপ কাজ করেছি? মা-বোন জ্ঞান কি আমার নেই?

সুধীর আর কথা বাড়াইল না। শুধু বলিল—আমরা ভাল কথাই বল্‌ছি; তোমার এতে রাগ করাটা অন্যায়।

রাখাল আর দাঁড়াইতে পারিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। নানা দুঃখে, রাগে, অনুশোচনায় তার মাথার ঠিক রহিল না। রাস্তায় চলিতে চলিতে পথে দু'একজনের সহিত ধাক্কা লাগে। তাহারা গজ্‌ গজ্‌ করিয়া কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। রাখাল তাহাতে কান দিল না। তাহার মনে সমস্ত কথা পথেই জাগিয়া উঠিল। কপালের আঘাতটা অনেক দিনই সারিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার যেন মনে হইল সেইটাই আজ অকস্মাৎ টন্‌ টন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া উঠিতেছে। এক একবার কপালে হাত দিয়া দেখে আর রুমালে মুখ মোছে। বাড়ী ফিরিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না। সে ভাবিয়া পাইল না, কেমন করিয়া কি বলিয়া সে সীতানাথবাবুর বাসা ত্যাগ করিবে। সত্যই সুরুচিকে সে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসাটা কি এতই নিন্দনীয় যে, বন্ধুরা আজ তাহাকে এমন করিয়া শুনাইল। এটা কি সত্যই সমাজ মানিবে না? তা মানিবে কেমন করিয়া—সে ত বাহিরের দিকেই তাকাইয়া ব্যবস্থা দেয়; মানুষের অন্তর দেখিবার মত তার চক্ষু কোথায়? পরক্ষণেই সুরুচির বিবাহসম্বন্ধে ভবিষ্যত আশঙ্কাটা

রাখালের বুকের ভিতর কেবল মোচড় দিতে লাগিল। পথেই সে ভাবিয়া স্থির করিল, যেমন করিয়াই হউক সীতানাথবাবুর বাসা কাল তাহাকে ছাড়িতেই হইবে। সুরুচির অনিষ্ট—তা'র মায়ের ক্ষতি, সে প্রাণান্তেও করিতে পারিবে না।

ছয়

রাখাল কোন দিন এত রাত করে না। সুরুচি ভাবিয়া আকুল। তিন তিনবার দুধের বাটী হাতে করিয়া ঘরে আসিল। দেখিল, তখনও রাখাল ফেরে নাই। তাহার প্রাণে ভয় হইল —কোথাও সেদিনের মত জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া নাই ত। তাহার গন্তব্যস্থানও কেউ জানে না। জানিলে না হয় সুরুচি একবার কেষ্ট চাকরকে পাঠাইয়া খোঁজটা লইয়া বাঁচে। সে যেন ছট্‌ফট্ করিয়া মরে। একবার ঘরে আসে—একবার দোতলার বারাণ্ডার উপর দাঁড়ায়—একবার কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করে; এমনি করিয়া সে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

রাত তখন এগারটা, রাখাল ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সুরুচি তাহা দরজার শব্দ পাইয়া বুঝিতে পারিয়াছে। সে উপরে তাড়াতাড়ি স্পিরিট ল্যাম্পটা জ্বালিয়া দুধের বাটীটা তাহার উপর চাপাইয়া দিল। একেবারে দুধ লইয়া যাইবে; এজন্য বার বার দুধের ভিতর আঙ্গুল দিয়া দেখে, বেশ গরম হইয়াছে কি না।

রাখাল ঘরে ঢুকিয়াই মদের বোতলটা তাক হইতে পাড়িল। মনে করিয়াছে, এত রাত্রে কেহ জাগিয়া নাই। সকলেই ঘুমাইয়াছে। তাই দরজা বন্ধ আছে কি না, তাহা আর দেখিল

না। রোজ দুধ দিয়া মিশাইয়া মদ খায়—আজ আর দুধের প্রয়োজন বোধ করিল না। চিন্তার বিষ তাহার মাথায় উঠিয়াছে। অত ভাবিবার সময় নাই। বোতলের ছিপিটা খুলিয়া খানিকটা মদ একটা চায়ের কাপে ঢালিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় সুরুচি গরম দুধের বাটীটা তলায় কাপড় দিয়া ধরিয়া ঘরে ঢুকিল। রাখাল কিছুই বুঝিতে পারে নাই। মদের তীব্র গন্ধে ঘরখানা ভরিয়া উঠিয়াছে। কাপটা যেমন মুখে দিয়া খাইতে যাইবে, পিছন হইতে অমনি সুরুচি জিজ্ঞাসা করিল—ও কি খাচ্ছ?

রাখাল থতমত খাইয়া গেল। কিছু নয়—কিছু নয়, বলিয়া এক নিশ্বাসে কাপটা শেষ করিয়া ফেলিল।

সুরুচি নাক সিট্‌কাইয়া কহিল—উঃ—কি বিশ্রী গন্ধ—ও কি খেলে?

রাখাল বলিল—ও ওষুধ—ওষুধ, ডাক্তারে খেতে বলেছে ম্যালেরিয়া রোগের জন্য।

দেখি বোতলটা—বলিয়াই সুরুচি খপ্ করিয়া টেবিলের উপর হইতে বোতলটা হাতে করিয়া ধরিল। বোতলের গায়ের লেখাটা পড়িতে চেষ্টা করিল। ইংরাজী লেখা কিছু না পড়িতে পারিলেও—এটা যে মদ—সেটা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। তারপর রাখালের দিকে ফিরিয়া বলিল—তোমাকে এ ছাই কে খেতে বলেছে?

রাখালের তখন কিছু ভাল লাগিতেছে না। সে কেমন রাগিয়াই

উত্তর দিল—যেই বলুক। তুমি ওপরে যাও, মা। এখানে আর থেক' না বা এস না।

সুরুচি কহিল—তুমি ত এ মদ খাচ্ছ?

রাখাল বলিল—হাঁ—হাঁ—খাচ্ছি—তুমি যাও।

সুরুচি নড়িল না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—কোত্থেকে এলে তুমি এমন হ'য়ে? এইত সন্ধ্যের সময় দেখ্লুম ভাল ছিলে।

রাখাল ইহার একটা অশ্লীল উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তখনো তাহার নেশা বেশ পাকে নাই—তাই থামিয়া গেল। সে কেবল চায় এখন সুরুচিকে ঘর হইতে সরাইয়া দিতে। বলিল—যাও না মা, শোও গে যাও না। এখুনি কে কি বল্বে।

সুরুচি কথাটা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে; তাই উত্তর দিল—যে যা বলে বলুক। তুমি মদ্ কেন খাচ্ছ? কতদিন ধ'রে তুমি এ অভ্যাস ধরেছ? তোমায় এ নেশায় কে মজালে?

রাখাল আর ভাল বুঝিল না। কুৎসাটা যখন বাহিরে বন্ধুমহলে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—তখন বাড়ীতে রটিতে কতক্ষণ। হয়ত পাঁচজনে বলাবলি করে। তাহাকে সাহস করিয়া কেহ মুখের উপর বলিতে আসে না। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আঃ—বিরক্ত কর্লে; যাবে কি না?

সুরুচি কহিল—চেঁচাচ্ছ কেন? বাবা, মা শুন্লে মনে কর্বে কি?

রাখাল একটু জোর গলায় বলিল—মনে কর্‌বে বলেই ত যেতে বল্‌ছি। যাও—আমার বোতল দিয়ে যাও।

সুরুচি তখনও বাঁ হাতে বোতলটা ধরিয়া আছে—ছাড়ে নাই। গরম দুধের বাটীটা টেবিলের উপর আস্তে আস্তে রাখিয়া বলিল—আমি তোমায় আর খেতে দোব না। যা খেয়েছ—ওই শেষ। এই নাও দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়।

রাখাল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। শিক্ষার সংযম, বিনয়, অনৌদ্ধত্যের উপর পদাঘাত করিয়া সে বোতলটা সুরুচির হাত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। একটু নেশাও যে না হইয়াছিল, তা নয়। সুরুচি কিছুতেই ছাড়িবে না। যথেষ্ট চেষ্টা করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আঁটকাইয়া রাখিতে পারিল না। সুরুচির সজল চোখের উপর কঠোর দৃষ্টিতে তাকাইয়া রাখাল বোতলটা তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুরুচি তখন বলিয়া উঠিল—তোমার মার দিব্যি—আমার দিব্যি—যদি আর এক ফোঁটাও খাও।

কে কার কথা শোনে। কে কার দিব্য-শপথ মানে। রাখাল তাহার সম্মুখেই আবার কাপে মদ ঢালিয়া খাইতে লাগিল। সুরুচি কিছু বলিতে পারিল না। কি আর বলিবে? রোগীর সেবা করিতে পারিয়াছে বলিয়া কি মাতালকে শাসনে রাখিতে পারিবে। বুকখানা

তাহার রাখালের ভাবগতিক দেখিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে একবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—দুধ খাবে না ?

রাখাল মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল—না—না—নিয়ে যাও। এই বলিয়া রাখাল দুধের বাটীটা সুরুচির গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল। উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইয়া বাটীটা সুরুচি আর মেঝের উপর পড়িতে দিল না। যদি শব্দ পাইয়া সকলে জাগিয়া ওঠে—এই ভয়ে বুকের কাপড়েই তাড়াতাড়ি বাটীটা জড়াইয়া ধরিল। গরম দুধে তার সমস্ত বুকখানা ভিজিয়া গিয়াছে। সে যেন ভয়ে কি করিবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

রাখাল আপন মনে বকিয়া যায়—মোহে পড়েছি, মোহে পড়েছি। কিসের মোহ? রূপের—না—স্নেহের—না—ভাল-বাসার ? পাশ ফিরিয়া দেখে তখনও সুরুচি যায় নাই। রাখাল সুরুচির পানে তাকাইয়া আবার বলিল—মা, তুমি তোমার ঘরে যাবে কি না ? তোমার বাপ, মা তোমাকে আমায় ছেলে ব'লে ডাক্‌তে দিয়েছে বলে কি তুমি এই রাত্রে—নাঃ—কোন কথা বল্‌তে চাই না—তুমি যাবে কি না বল ?

সুরুচি দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—না, যাব না।

রাখাল কাপটা হাতে লইয়া বিছানার উপর বসিয়া বলিল—ছেলের এ কীর্ত্তি দেখে আনন্দ পাচ্ছ ?

—খুব পাচ্ছি।

—তবে পাও।

রাখাল কিছু না বলিয়া আর একটু মদ কাপে ঢালিতে ঢালিতে বলিল—মা, আমি কাল বিদেয় হচ্ছি। ভাব্‌ছ বুঝি—আমি মাতাল হ'য়ে গিয়ে যা' তা' বল্‌ছি—তা নয়। আমার জ্ঞান বেশ আছে। এ খাচ্ছি আমার উপকারের জন্যে। বুঝ্‌লে মা—কাল বিদেয় হচ্ছি।

সুরুচি জিজ্ঞাসা করিল—কোথায়?

রাখাল উত্তর দিল—যমালয়ে।

উপরে একটা খুট্‌ করিয়া শব্দ হওয়াতে সুরুচি ভাবিল—বোধ হয় কেহ উঠিয়াছে। দরজার বাহিরে মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, একটা কাল বিড়াল দৌড়িয়া যাইতেছে।

রাখালের কথা এইবার জড়াইয়া জড়াইয়া বাহির হইতেছে। পূর্ণ মত্ততার আর বেশী বিলম্ব নাই। সুরুচি একবার ভাবিল—চুপি চুপি কেষ্টকে ডাকিয়া আনে। কিন্তু সাহস হইল না—যদি সে সব বলিয়া দেয়। তা দিক—তাতে তার দুঃখ নাই। এ মাতাল ছেলে লইয়া কি করিবে। এতে যে লোকে জানিতে পারিলে তাহাকেই নিন্দা করিবে। অনুমান করিল—নিশ্চয়ই রাখাল কুসঙ্গে মিশিয়াছে। শিক্ষার দৃঢ়তা থাকিলে কি হইবে—সঙ্গস্রোতে সবি ভাসিয়া যায়। নহিলে এমন নেশা করিতে শিখিল কেমন করিয়া! সেই বা এ ব্যাপার চাপিয়া রাখিবে ক'দিন। সীতানাথবাবু ত টের

পাইবেনই! তখন যে সকলে তাহার সম্মুখেই এত সাধের মাতাল ছেলেকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। সে অপমানের জ্বালা যে তারও বুকে আসিয়া বাসা বাঁধিবে। সে ত তখন একটা কথা বলিতে পারিবে না। বলিবার মুখও যে তাহার থাকিবে না।

রাখাল বলিতে লাগিল—বুঝ্‌লে না—এ সহজ কথাটা? আমি যে তোমার মোহে পড়েছি। সকলে এই কথা বলে, যেহেতু—যেহেতু—আমি bachelor—অবিবাহিত—আর তুমি—

সুরুচি বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কারা বলে?

রাখাল মাথা নাড়িতে নাড়িতে উত্তর দিল—সকলে, সকলে। তোমায়ও কি বলে না, মা—তুমি আমার মোহে পড়েছ? নিশ্চয়ই বলে তোমার বন্ধু বান্ধবেরা!

সুরুচি কিছুই বুঝিতে পারিল না। এদিকে রাতও বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। বাড়ীতে কেহই জাগিয়া নাই। সকলেই ঘুমাইতেছে। তার উপর বাহিরে আকাশের বৃষ্টি নামিয়াছে। জলের শব্দে এদের কণ্ঠস্বর একরকম মাথা তুলিতে পারিতেছে না। তা হইলেও সুরুচির অন্তঃকরণ শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। তবু এমন অবস্থায় রাখালকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে তাহার মন চাহিল না।

রাখাল ধীরে ধীরে কথা কহিতেছে; আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে সুরুচির ইচ্ছা হইল না। সে কি রাখালের মুখে এই

ঘৃণিত কথাগুলো শুনিবার জন্য আরো দাঁড়াইয়া থাকিবে? তাই চলিয়া আসিতেছিল।

রাখাল ডাকিল—মা—মা—

রাগে, ঘৃণায় সুরুচির সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। তাহার মাথার চুল এলাইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকটি যেন দলিতা ফণিনীর মত লটপট করিতেছিল। 'মা' ডাক শুনিয়া ঘৃণাভরে সুরুচি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কি বল্‌তে চাও? আমাকে আর 'মা' বলে ডেক না। তোমার নিজের মায়ের কাছে এরকম বেহায়াপানা কর'গে—খুব শোভা পাবে'খন। আমার কাছে আর ও মুখ দেখিও না! আমারি লজ্জা করে—তোমার না করুক।

কথাকটা বলিয়াই সুরুচি মুখ ফিরাইয়া লইল। রাখাল কহিল—আর দেখ্‌তে হবে না, মা। সুরুচি শুনিয়াও শুনিল না। খালি বাটীটা তখনো বুকের কাছে তেমনি আঁচলে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। ঘরের বাহিরে আসিয়া সুরুচি আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সাত

সে-রাত্রে সুরুচির আর ঘুম হইল না। কি ভাবিয়া কেবলি বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। সুরুচি চলিয়া গেলে রাখাল আর স্থির থাকিতে পারিল না। বোতলটা তাকে তুলিয়া রাখিয়া অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকাল হইয়া গেল। রাখাল বিছানা হইতে ওঠে না। সে তখন নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। বাড়ীর সকলে জাগিয়া উঠিল, রাখাল কিন্তু জাগিল না। সকলে মনে করিল, রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছে। কেহ আর সেজন্য তাহাকে জোর করিয়া জাগাইয়া দিল না। সুরুচি কারণটা জানিত। সে কাহাকেও কিছু বলে নাই। তাহার মনে তীব্র ঘৃণা জাগিয়াছে। সে এক একবার মনে করে, আর সে রাখালের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবে না। রাখালের কাছেও যাইবে না। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। মাঝে মাঝে রাখালের ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসে, রাখাল উঠিল কি না।

সেদিন রাখাল অনেক বেলায় চোখ চাহিল। সকালে রোজ ছেলে পড়াইতে যাইত। সেদিন আর গেল না। ঘুম হইতে উঠিয়া গালে হাত দিয়া নানান কথা ভাবিতে লাগিল। সুরুচি

দু’ একবার রাখালের ঘরে ঢুকিয়াছিল ; রাখাল কিন্তু তাহার সহিত কোন কথা কহে নাই। রাত্রের ঘটনা রাখালের সমস্ত মনে নাই। যেটুকু মনে আসিতে লাগিল—তাহাতেই আন্তরিক লজ্জায় সে মুখ নীচু করিয়াই রহিল। সুরুচির সম্মুখে মুখ তুলিবার সাহস তাহার আর নাই।

আরও একটু বেলা বাড়িলে সুরুচি আহারের জন্য রাখালকে ডাকিতে আসিল ; রাখাল ‘যাই’ ‘যাই’ করিয়া আর উঠিল না। ঠিক সেই সময় কেষ্ট একখানা চিঠি আনিয়া রাখালের হাতে দিয়া বলিল—মাষ্টার বাবু, আপনার চিঠি। রাখাল তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লইয়া এপিঠ্ ওপিঠ্ দেখিয়া বুঝিল, কলিকাতার এক আফিসে একটি পদ খালি হওয়াতে সে বহুদিন পূর্ব্বে পদপ্রার্থী হইয়া আবেদন করিয়াছিল ; এ তাহারি উত্তর আসিয়াছে। খুলিয়া পড়িয়া বুঝিল—আফিসের সাহেব তাহাকেই কাজ দিতে চায়। সে যেন অতি অবশ্য বিলম্ব না করিয়া সাক্ষাৎ করে। রাখাল চিঠি আর রাখিল না। তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সুরুচি জিজ্ঞাসা করিল—ও কার চিঠি? বাড়ী থেকে তোমার মা লিখেছেন?

রাখাল মুখ নীচু করিয়া উত্তর দিল—না।

সুরুচি বলিল—তা—অমন করে চিঠি ছিঁড়ে ফেল্‌লে কেন?

রাখাল কহিল—ও বাজে চিঠি ; কোন প্রয়োজন নেই আর।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সুরুচি বলিল—তুমি আজ অমন করে আছ কেন? লজ্জা কিসের? আমি ত আর ঢাক পিটে বেড়াই নি। তুমি স্নান করে খেয়ে নাও। আর ভাল চাও ত ও পাপ আর ছুঁয়ো না।

এ কথায় রাখাল কোন উত্তর দিল না। সুরুচির কথামত স্নানাহার সারিয়া আবার শুইয়া পড়িল। এখন রোজ রাত্রে রাখাল বন্ধুদের আড্ডায় গিয়া বসে। রোজই নিজের কুৎসা, অযাচিত উপদেশ, নিজের কানে শুনিয়া আসে। নিত্য শুনিয়া শুনিয়া সে অতিষ্ঠ হইয়া মনে মনে ঠিক করিল, আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না; যা হয় একটা কিছু করিতেই হইবে।

সেই দিন রাত্র হইতে সুরুচি লক্ষ্য করিতে লাগিল—রাখাল বড় বাড়াইয়াছে। এইবার সীতানাথবাবু ধরিয়া ফেলিবেন। সেও ভয়ে সঙ্কোচে বাপ মাকে লুকাইয়া এক একবার রাখালকে তাড়া দিতে আসিত বটে; কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলিত না। রাখাল তাহার কথা শুনিতে চাহে না। সে এখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। বন্ধুরাই যেন তাহাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। স্থির করিল—আত্মহত্যা করিবে। আর এ জীবন রাখা কোনও মতে উচিত নয়। সে নিজে বেশ বুঝিয়াছে, সে মাতাল ছাড়া আর কিছু নয়। তাহার জীবনে কেহই উপকার পাইবে না। আপনার মা, ভাই, বোন—তাহাদের দেখিতে পারিল না।

উপরন্তু পরাশ্রয়ে থাকিয়া এখানে এমন একটা কুৎসা সৃষ্টি করিয়া বসিল—যাহা কখনও দূর হইবে না। যাক—যা হবার হ'ক ; সে মরিয়া বাঁচুক। তাহাকে আর দেখিতে হইবে না। তাহাকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। মরিয়া গেলে, শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বান্ধবদের আর সামাজিক সদুপদেশ শুনিতে হইবে না। আত্মহত্যা খারাপ—হ'ক খারাপ ; কোন্ কাজটা সে ভাল করিয়াছে ? সে যে নিজের মা, ভাই, বোন ছাড়িয়া পরাশ্রয়ে বাস করিতেছে—এটা কি তার ভাল হইতেছে ? সে যে একটা অবিবাহিতা মেয়ের সর্ব্বনাশ করিতেছে, মাত্র তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া—এটাও কি তার ভাল হইতেছে ? সে যে এই মদ ধরিয়াছে, এটাও কি ভাল ? সবই মন্দ—তখন কেন না সে আত্মহত্যা করিবে।

একদিন দুপুরবেলা সুরুচি তাহার ঘরে আসিলে সে তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিল। আত্মহত্যার কথাটা কখন যে সে এত কথার মাঝে বলিয়া ফেলিয়াছে, তা সে নিজে জানিতে পারে নাই। সুরুচি সে কথাটা বেশ মনে করিয়া রাখিয়াছে। কেন রাখাল এমন হইয়া যাইতেছে, এইবার সে সমস্ত বুঝিতে পারিল। ভবিষ্যত উন্নতির আশায় সে নিজের সংসার ছাড়িয়া পরের সংসারে এ রকম আপন হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু পাঁচ জনে সেটা পছন্দ করে নাই। তাহাদের চক্ষে ইহাদের মা-ছেলে-সম্বন্ধটা একটা কুৎসিত রূপ ধরিয়া

দাঁড়াইয়াছিল। তাই আঘাতে আঘাতে রাখাল এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

সুরুচি সমস্ত শুনিয়া বলিল—তা বেশ। আমি বাপ মায়ের মুখ থেকে কোন কথা শুনি নি। বাইরে যখন তোমার বন্ধু বান্ধবেরা এইটা নিয়ে এত জল্পনা কল্পনা কর্‌ছে—তখন তোমার আর এখানে থাকা উচিত নয়। আমার বয়স হয়েছে। বাপ মার আদরে আছি বলে—তাঁরা আমার অল্পবয়সে বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের পুণ্য লাভ কর্‌তে চান্‌নি। আমার বিয়ে না হলেও সমাজকে চেনবার মত বুদ্ধি শক্তি আমার একটু আছে। তুমিও শিক্ষিত—সবই বোঝ। তখন এই মিথ্যা আলোচনাটা আর বাইরে বাড়িয়ে কাজ নেই। তোমার আর এখানে থাকা হবে না। তুমি বাড়ী গিয়ে মার কাছে থাক'। মাঝে মাঝে এসে আমায় দেখে যেও; আমি তাইতেই সুখী হ'ব। আর এক কাজ কোরো—ওই মদ খাওয়া ছেড়ে দিও। বল তুমি আমার গা ছুঁয়ে—ও আর খাবে না?

রাখাল কহিল—না, আমি তা শপথ কর্‌তে পার্‌ব না। আমি যে শপথ ক'রে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এসেছি, সেইটাই আমার পূরণ হল না যখন—তখন আমি আর মার কাছেও যাব না।

সুরুচি জিজ্ঞাসা করিল—কি শপথ করেছিলে?

রাখাল বলিল—যাক্‌গে তা, বলে কাজ নেই। অর্থ উপায় আমার ভাগ্যে হবে না। আর এখন মনের যে রকম অবস্থা, তাতে

আমি আর এক পয়সাও উপায় করতে পারব না—চাইও না আর পয়সা উপায় করতে। আমার আর মনের জোর নেই। আমার সব বুকখানা দুর্ব্বলতায় ভরে গেছে। আমি এবার যা হয় ক'রব।

সুরুচি জিজ্ঞাসা করিল—কি করবে? আত্মহত্যা?

রাখাল চমকিয়া একবার সুরুচির পানে চাহিয়া বলিল—হাঁ, তাই।

সুরুচি কহিল—তা করবে, কর'গে যাও। আমাদের এ বাড়ীতে নয়। বুঝতে পারছ—তোমার ও কাজের সঙ্গে আমার ভাগ্যটাও কি রকম জড়িত হয়ে যাবে?

রাখাল বলিল—কেন?

সুরুচি বেশ জোর করিয়া বলিল—এই আমায় 'মা' বলেছিলে বলে। তোমার সঙ্গে তালে আমায়ও মরতে হবে। কিন্তু আমি মরতে চাই না। তোমার মত কাপুরুষ নই—আমি বাঁচতে চাই।

রাখাল কহিল—বিনা দোষে সকলের ওই কলঙ্কের বোঝা মাথায় বয়ে আমায় থাকতে হবে?

সুরুচি বলিল—হাঁ হবে। যদি আমায় মায়ের মত দেখে থাক, যদি আমার ভাল চাও—তাহলে হাসিমুখে ওই বোঝা ঘাড়ে ক'রে বেড়াতেই হবে। সময় হলে যারা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল, তারা নিজেরা এসে নামিয়ে দেবে।

রাখাল কহিল—তোমার বাপ, মাও এইরকম আমায় মনে করেন নাকি ?

সুরুচি বলিল—এখন না হয় না মনে কর্‌তে পারে ; কিন্তু এইগুলো যখন তাদের কানে গিয়ে উঠবে, তখন যে মনে কর্‌বে না—তার কি মানে আছে ?

রাখাল চুপ করিয়া রহিল ; সুরুচির কথাগুলো যেন বুঝিয়াও বুঝিল না।

সুরুচি আবার জিজ্ঞাসা করিল—কি খেয়ে তুমি মর্‌বে ? আফিং ?

রাখাল সহজ ভাবেই উত্তর দিল—না।

সুরুচি বলিল—তবে ?

রাখাল কহিল—পোটাসিয়াম সাইনায়েড্‌। আমি যখন কলেজে পড়্‌তুম, তখন এম্‌নি খেয়ালের বশে একটুখানি একটা ছোট শিশি করে, বাড়ীতে এনে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলুম। আজ দেখ্‌ছি সেটা আমার কাজে লাগ্‌বে।

সুরুচি সাহস করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় সেটা ?

রাখাল গম্ভীরভাবে বলিল—আমার কাছেই আছে। বাড়ী থেকে কাল নিয়ে এসেছি।

সুরুচি রাখালের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। বেশ কাঁদ-কাঁদ স্বরেই বলিল—দোহাই তোমার। তুমি এক্ষুনি বাড়ী চলে

যাও। আমি বাবা এলে বল্‌ব—'তুমি আর এখানে থাক্‌বে না; সুবোধকে পড়াবে না'—এই কথা বলে গেছ। বল তুমি—এক্ষুণি যাবে কি না বল? আমায় যখন 'মা' বলে ডেকেছ—আমার মুখ তুমি চাও। আমার মুখখানা এমন করে পুড়িও না। আর তা যদি না কর—আমি সমস্তই বাবাকে খুলে বল্‌ব; কোন কথা ঢাক্‌ব না। কেন ঢাক্‌ব—আমি ত অন্যায় কিছু করিনি।

সুরুচি আরও বলিয়া গেল। রাখালের আর এখানে থাকা একেবারে উচিত নয়। সে এখানে থাকিলে সুরুচি চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। রাত নাই—দিন নাই—তাহাকে ছুটিয়া ছুটিয়া এ ঘরে আসিতেই হইবে। না আসিলে তাহারও মনটা কেমন হইয়া ওঠে। পুত্রবাৎসল্য এমন, তা সে আগে জানিত না। সেটা যে অমন সকল সামাজিক প্রথাবন্ধনকে চরণে দলিত করিয়া যাইতে চায়—সে কি তাহা আগে জানিত? জানিলে কখনই সে এমন করিয়া পরের ছেলেকে কোলে টানিয়া রাখিত না। এ ত তাহার একটা শিক্ষা হইয়া গেল। বই পড়িয়া মানুষ কত শিক্ষা পায়? এই ত আসল জ্ঞান। মানবজীবনের প্রতিদিনের ঘাত প্রতিঘাতে কত জ্ঞান, কত শিক্ষণীয় বস্তু, কত জ্ঞাতব্য বিষয় উচ্ছলিত হইয়া পড়ে—তা কে বলিতে পারে!

সেইদিন রাত্রে রাখাল ক্লাবরুম হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনেক ভাবিয়া আত্মহত্যা করাই স্থির করিল। আর দেরী করিলে চলিবে

না। সে বুঝিত, আত্মহত্যা আজ করিব, কাল করিব, বলিয়া তুলিয়া রাখিলে—আর করা হইবে না। জীবনটার উপর তাহার একটা বিরক্তি ও ধিক্কার জন্মিয়া গিয়াছে।

তাড়াতাড়ি নিজের ট্রাঙ্কটা খুলিয়া পটাসিয়ম সাইনাইডের শিশিটা বাহির করিয়া আনিয়া খানিকটা একটা কাপে মদের সহিত মিশাইয়া রাখিল। সীতানাথবাবুকে সকল কথা খুলিয়া একটা চিঠি লিখিয়া যাইবে, এই মনে করিয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল।

চিঠি তাহার আর শেষ হয় না। পাতার পর পাতা লিখিয়া চলিয়াছে—আদ্যন্ত জীবনকাহিনী। প্রতিপদক্ষেপে যে ধাক্কা, যে বাধা পাইয়াছে—তাহাতেই রূপ দিয়া সকরুণ করিয়া তুলিতেছে। গভীর মনোযোগের সহিত সে তখন চিঠি লিখিয়া চলিয়াছে।

এত রাত্রে রাখালের ঘরে কেন আলো জ্বলিতেছে—ইহা দেখিবার জন্য ঠিক সেই সময় সুরুচি ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিয়া রাখালের পিছন হইতে চিঠির খানিকটা পড়িয়া ফেলিল। তাহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না—রাখাল এখুনি আত্মহত্যা করিবে। সে আর কালবিলম্ব না করিয়া যে কাপে বিষ মিশ্রিত মদ ছিল তাহা বেশ জোর করিয়া ধরিল। সে জানিত না, উহাতেই বিষ আছে। তবু ওইটাই যে বিষপাত্র, একথা তার অন্তর যেন তাহাকে বলিয়া দিল। রাখাল তাহা টের পায় নাই। সুরুচির হাত পা কাঁপিতেছে। কেমন করিয়া কাপটা লইয়া বাহিরে চলিয়া যাইবে

ইহা আর ভাবিয়া পাইল না। তাহার যেন হাত আর উঠিতেছে না। পা যেন তার অবশ হইয়া আসিতেছে। কেবলি ভয়—এই বুঝি রাখাল ধরিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া সুরুচি ভাবিতেছে। তার মাথার কাল ছায়াটা যে রাখালের সম্মুখে পড়িয়া কাগজের উপর দোল খাইতেছে—এটা আর সুরুচি বুঝিতে পারে নাই।

রাখালেরও সে দিকে মন ছিল না। সে দু'চোখের জল পুঁছিতেছে আর লিখিয়া যাইতেছে। হঠাৎ সুরুচির হাতের দু'এক গাছা সোনার চূড়ী, যেমন সে কাপটা তুলিয়া আনিবে, অমনি বাজিয়া উঠিল। রাখাল চমকিয়া ফিরিয়া দেখে—সুরুচি। সে যেন হিংস্র ব্যাঘ্রের মত লাফাইয়া উঠিল। এমন সুযোগ যদি তা'র আজ নষ্ট হইয়া যায়; তাহা হইলে আর আত্মহত্যা করা হইবে না। সারাজীবন এমনি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। সে তাই কর্কশস্বরে সুরুচিকে চীৎকার করিয়া বলিল—কেন তুমি রোজ রোজ রাত্রে আমায় বিরক্ত করতে আস? মনে করেছিলুম, মাকে একখানা চিঠি লিখে যাব—তা আর লিখতে দিলে না তুমি। রইল লেখা, দাও কাপটা—ওতে কিছু নেই। আমায় খেতে দাও—আমায় খেতে দাও।

রাখাল কাপটা জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে চায়। সুরুচি আর উপান্তর না দেখিয়া সজোরে কাপটা ছুঁড়িয়া দেওয়ালে মারিল; আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল—বাবা—বাবা, কেষ্ট—

কেষ্ট—শীগ্‌গীর আয়—শীগ্‌গীর আয়। মাষ্টার বাবু মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে গেছে—মাতাল হ'য়ে গেছে।

রাখাল আর থাকিতে পরিল না। তাহার ধৈর্য্য এইবার সীমা ছাড়াইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে মদের বোতলটা লইয়া সুরুচিকে ছুঁড়িয়া মারিল। সুরুচি একটু ঝুঁকিয়া পড়িতেই, বোতলটা মাথার উপর দিয়া ছুটিয়া গিয়া দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া মেজের উপর আছ্‌ড়াইয়া পড়িল। সুরুচি ও রাখাল দু'জনেই কাঁপিতেছে। রাখাল মাথা ঠিক রাখিতে না পারিয়া সুরুচিকে ধাক্কা দিয়া এক কোণে ঠেলিয়া দিল।

সুরুচির চীৎকারে ও ঝন্ ঝন্ শব্দে সকলেই দৌড়িয়া আসিল। সীতানাথ বাবু সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ভীষণ রাগিয়া গেলেন। রাখালকে অত্যন্ত গালিগালাজ করিতে লাগিলেন। এতরাত্রে সুরুচি কেন রাখালের ঘরে আসিয়াছে, একথা জিজ্ঞাসা করিতে রাখাল সুরুচির মুখের কথা কাড়িয়া নিজেই জবাব দিল—আমি নীচে থেকে মাকে চেঁচিয়ে ডেকে এনেছি।

সীতানাথ বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

রাখাল আর কিছু বলিতে পারে না। তাহার সর্ব্বশরীর ফুলিতে থাকে।

সীতানাথ বাবু উত্তেজিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

এবার রাখাল আর থাকিতে পারিল না। সীতানাথবাবুর মুখের উপরই বলিল—বেশ করেছি ; আমার খুসী।

কথাটা বলিয়াই রাখাল বাহির হইয়া আসিতেছিল। সীতানাথবাবু আরও রাগিয়া উঠিলেন। ঘরময় ভাঙা কাঁচ ছড়ান। তাহার উপর মদের গন্ধ। ভাঙা বোতলটায় তখনও খানিকটা মদ রহিয়াছে, সকলে দেখিতে পাইল। এই সব দেখিয়া সীতানাথবাবু উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—কেষ্ট, আমার চাবুক নিয়ে আয়। আচ্ছা করে মাষ্টার বাবুকে চাবুক লাগা।

কথা শুনিয়া রাখাল আর অগ্রসর হইল না। পিছাইয়া আবার ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। কেষ্টকে সীতানাথবাবু আবার চাবুক আনিতে হুকুম করিলেন। কেষ্ট দৌড়িয়া চাবুক আনিতে গেল। সুরুচি কেমন ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিল—মা, ওকে আর মার্ ধর্ করে দরকার নেই। এম্‌নি যেতে দাও। কোত্থেকে মদ খেয়ে এসে অমন মাতাল হয়ে গেছে। আমি ওপরে কলঘরে যাচ্ছিলুম। নীচে থেকে আমায় 'মা', 'মা' বলে চেঁচিয়ে ডাক্‌লে ; আমি তাড়াতাড়ি, কি হয়েছে, এই ভেবে ছুটে এলুম। এসে দেখি—ওই রকম করে টল্‌ছে।

সুরুচির মাও দেখিলেন এবং বুঝিলেন, ব্যাপারটা কিছু প্রিয় নয়। তার উপর তাঁহার ঘরে অবিবাহিতা মেয়ে। আশ পাশের

বাড়ীর লোক এখনও কিছু জানে নাই। সুতরাং এর যবনিকা এখানেই ফেলিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

তাই তিনি স্বয়ং উপযাচিকা হইয়া, রাখালকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। রাখাল আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

কেষ্ট উপর হইতে চাবুক লইয়া নামিয়া আসিতে, সুরুচির মা তাহাকে বলিলেন—ওরে কেষ্ট, বেশ খুঁটে খুঁটে কাঁচের কুঁচিগুলো তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে আর এখুনি। জল ঢেলে ঘরটা ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেল্। মষ্টার বাবু এলে, আর বাড়ী ঢুক্‌তে দিস্ নি। বল্‌বি—গিন্নীমার হুকুম নেই। যত সব লক্ষীছাড়া অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড আমারি বাড়ীতে ছি—ছি!

অর্দ্ধসমাপ্ত চিঠিখানা আর রাখাল লইয়া যাইতে পারে নাই। সকলের অলক্ষ্যে সুরুচি সেইখানা যত্নের সহিত তুলিয়া ভাঁজ করিয়া বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিল।

সীতানাথবাবুর বাড়ীতে দুইজন ঝি রাতদিন কাজ করিত· তাহারা দুইজন তখনই এ ব্যাপারটা লইয়া পরস্পর গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্ করিতে লাগিল। সুরুচির মা তাহাদের ধমক দিয়া থামাইয়া সুরুচিকে লইয়া উপরে চলিয়া গেলেন। সেই রাত্র হইতেই সীতানাথবাবু সুরুচির বিবাহের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন।

আট

সীতানাথবাবুর উপর রাখালের একটা রাগ চাপিয়া রহিল। বিশেষ কারণ তার না থাকিলেও, রাখালের কাছে কারণের অভাব হইল না। 'মাষ্টার বাবুকে চাবুক লাগা'—এ কথাটা তাহার আত্মাভিমানে বেশ বাজিয়াছিল। সীতানাথবাবুর ত সে কোন অনিষ্ট করে নাই। আচ্ছা দেখা যাক্—মরা তার হইল না। আত্মহত্যা করার অভিপ্রায়টা সে এখন মন হইতে মুছিয়া ফেলিল। সে আর মরিতে চায় না। তার জীবন যখন অমন যাইতে যাইতে ধাক্কা খাইয়া রহিয়া গেল—তখন সে দেখিবে, দুঃখ, কষ্টের, নিন্দা, অপমানের আর কত বাকি আছে। এখন সে চায় প্রতিশোধ। বন্ধু বান্ধবদের উপর তার ভীষণ ঘৃণা জন্মিয়াছে। কাহারও সহিত সে আর দেখা করিতে চায় না। কেউ ত তাহাকে চাহিল না। যে আপন করিয়া চাহিল—তাহাকেও পাঁচজনে লইতে দিল না। এমনি ইহাদের অত্যাচার—এমনি ইহাদের বিধান। সুরুচির জন্য প্রাণটা তাহার থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ওঠে। রাখাল সে-ভাবটা সবলে চাপিয়া রাখে; প্রকাশ করিতে চায় না। সে মহা অন্যায় করিয়াছে। ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিয়া রাত দুপুরে একটা অবিবাহিতা মেয়েকে লইয়া মদের বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি

করাটা তাহার কোন মতেই ভাল কাজ হয় নাই। হাজার লোকে জানুক, সে সুরুচিকে 'মা' বলিয়া ডাকে ; এ সব ব্যাপার শুনিলে কেহ তাহাতে আস্থা রাখিবে না। সকলেই তাহাকে দোষী বলিবে। সঙ্গে সঙ্গে সুরুচিকেও পাঁচ কথা শুনাইবে। যাক—ভালই হইয়াছে। সে আর উহাদের বাড়ী যাইবে না। তাহারাও তাহাকে আর ডাকিতে আসিবে না। তাহার বন্ধু বান্ধবেরা বাঁচিল। তাহাদের কুল, মান, সমাজ সকলি রক্ষা পাইল। কিন্তু তাহার অবস্থা কি হইবে ? সে কি ওই গালাগালটা নীরবে সহ্য করিবে ? পশুর মত তাহাকে চাবুক লাগাইতে চায়, এতদূর স্পর্দ্ধা সীতানথবাবুর ! এটা সে কোন মতেই ভুলিতে পারিল না। এত কাণ্ড হইত না—যদি না সুরুচি রাত্রে আসিয়া তাহার মরণ পথে অমন করিয়া বাধা দিত। সুরুচি ভাল করিয়াছে কি মন্দ করিয়াছে—এটা ঠিক করিতে পারিল না। এই রকম ভাবিতে ভাবিতে রাখাল বাকি রাতটা ও পরের দিনটা পাগলের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইল। সুরুচির কথা মনে আসিলে চোখ ফাটিয়া জল আসে। হায়—এত ভালবাসা, এত যত্ন, আদর, এতটা স্নেহ—সে ত জ্ঞানতঃ কাহারও কাছে পায় নাই। সুরুচি সমস্ত তুচ্ছ করিয়া সমাজের সকল বিধি ঠেলিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিবার জন্য এত কাণ্ড করিয়া বসিল। সে তার কি প্রতিদান দিয়া আসিল ? হয়ত, এতক্ষণে তাহার কলঙ্ক-কীর্ত্তনে

বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আত্মীয় স্বজন সকলে হয়ত শুনিয়াছে। কি হইবে—তাহার বিবাহ কেমন করিয়া হইবে! রাখালের বন্ধুরা যাহা আশঙ্কা করিতেছিল—এ যে তাহাই হইল।

বৈকালে গঙ্গার ধারে গিয়া চুপ করিয়া একলাটি বসিয়া রহিল। একদিনেই তাহার চেহারা এমন হইয়া গিয়াছে যে, দেখিলেই মনে হয়, একটা মলিন ছায়া তাহার চোখে মুখে তুলি বুলাইয়া বেশ শ্মশানের ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে। সারাদিন খায় নাই। খাইবেই বা কোথায়? সমস্ত ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সে এখন নিঃসম্বল। কিছুই সঙ্গে আনে নাই।

সেদিন একটু বেশী রাত্রে রাখালের বন্ধুবান্ধবেরা মজলিশ ভাঙ্গিয়া উঠিল। সকলে চলিয়া গেলে, সুধীর দরজা বন্ধ করিতে যাইবে, এমন সময় দেখে, রাখাল দরজার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইয়া আছে। কোন কথা বলিতেছে না। তাহার আকৃতি দেখিয়া সুধীর কেমন সন্দেহ করিল। তাহার হাত ধরিয়া ভিতরে আনিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন—রাখাল কিছুই উত্তর দিতে পারে না। সুধীর বুঝিতে পারিল—রাখাল একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। সেও তখন আর কিছু বলিল না।

রাখাল ঘরে আসিয়া বসিলে, সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—কি—ব্যাপার কি? আমায় খুলে বল না? সীতানাথবাবুর বাড়ীতে কিছু অন্যায় করে ফেলেছ না কি?

রাখাল মুখ তুলিয়া তাহার পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া বলিল—হাঁ—বড় অন্যায় করে ফেলেছি। আর শুধ্‌রে আস্‌বার উপায় নেই—পথও নেই। তাই এখন—; আর বলিতে পারিল না। ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুধীর তখন প্রবীন বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল—আর এখন আপ্‌শোষ করে কি হবে বল? যা করেছ—করেছ; আর অনুশোচনায় ফল কি? ও আমরা জান্‌তুম, ভাই, আগে—একটা কেলেঙ্কারি কিছু ঘট্‌বেই। সেই জন্যই তোমাকে অনেকবার সাবধান কর্‌তে লাগ্‌লুম; তুমি কিন্তু আমাদের কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌লেই না!

এই রকম কথা সমাজতত্ত্ববিদের মত মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া সুধীর অনেক বলিয়াই গেল। সকল কথা রাখাল মন দিয়া শোনে নাই। শুনিবার মত তাহার প্রবৃত্তি ছিল না।

তারপর সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—তুমি আজ এখানে থাক্‌বে?

রাখাল ক্ষীণতার সহিত উত্তর দিল—হুঁা—যদি একটু স্থান দাও।

সুধীর আবার জিজ্ঞাসা করিল—বোধ হচ্ছে, তোমার কিছু খাওয়া হয় নি?

রাখাল মুখ নীচু করিয়া কহিল—তোমার অনুমান সত্যি। আমায় কিছু খেতে দাও।

সে-রাত্রে সুধীর তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর হইতে খাবার আনিয়া রাখালকে খাওয়াইল। রাখাল সেই ঘরেই অর্থাৎ কি না ক্লাবরুমেই শুইয়া রহিল। রাখালের ঘুম আর আসে না। খানিক পরে সে উঠিয়া আলো জ্বালিল। একাকী ঘরে কিছুক্ষণ পাইচারী করিয়া এক কোণে চুপ করিয়া বসিল। হাতের কাছেই একখানা বাঙলা সাপ্তাহিক কাগজ পড়িয়াছিল। সে সেটা তুলিয়া লইতেই দেখে—একটা বিজ্ঞাপনের ধারে পেন্সিলের দাগ দেওয়া আছে। আর তারির নীচে কে লিখিয়া রাখিয়াছে—'রাখালের এ বিয়ে করা উচিত'। তাড়াতাড়ি বিজ্ঞাপনটা পড়িতে লাগিল। তাহাতে লেখা ছিল এই।

শিক্ষিত পাত্র চাই

যৌতুক স্বরূপ পাত্রীর মা নগদ বিশ হাজার টাকা ও কলিকাতার দু'খানা বাড়ী পাত্রের নামে লিখিয়া দিবেন। পাত্রী খুব সুন্দরী—এখনও লেখাপড়া শিখিতেছে। দুই বছরের কন্যাটি লইয়া মা গৃহত্যাগ করিয়া আসেন। তাহার পর দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি এখন কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে চান। যদি কেহ সাহস করিয়া তাঁহার এ সৎসঙ্কল্পে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলে············ ঠিকানায় স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করুন।

একবার দুইবার তিনবার রাখাল বিজ্ঞাপনটি পড়িল। গালে

হাত দিয়া সে অনেকক্ষণ ভাবিল ; তারপর কাগজখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া সুধীর ব্যাপারটা রাখালের মুখে ভাল করিয়া শুনিবার জন্য প্রথমেই ক্লাবরুমে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরের দরজা খুলিয়া চাহিয়া দেখে—রাখাল ঘরে নাই। একটু অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল, রাখাল ফিরিল না—তখন সুধীর দু'এক জন বন্ধুর বাড়ী গিয়া রাখালের কীর্ত্তির কথা জানাইয়া আসিল। বন্ধুমহলে বেশ একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। রাখাল ও সুরুচির কথা লইয়া অপ্রিয় আলোচনা হইতে আর বাকী রহিল না। হওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়—এটা স্বাভাবিক।

রাখাল পুরুষমানুষ—তাহার আবার লজ্জা কিসের ? সে কেন এমন ডুব মাড়িল ? ও ত হয়েই থাকে। সীতানাথবাবুরই দোষ ; তিনি কেন সাবধানে মেয়েকে রাখেন নাই ? থাকিতে খাইতে দিয়া কেন তিনি মাষ্টার রাখিয়াছিলেন ? ইত্যাদি রকমের অনেক আলোচনা—সমালোচনা—গবেষণা—সমস্তই হইয়া গেল। কিছুই বাদ পড়িল না। রাত্রে ক্লাবে আসিয়া রাখালের বন্ধুবান্ধবেরা প্রত্যেকেই সমাজের নাড়ি নক্ষত্র ঘাঁটিয়া অনেক কিছু বিচার করিয়া ফেলিল।

এদিকে সুরুচির বিবাহের জন্য সীতানাথবাবু অস্থির হইয়া

উঠিলেন। অনেক জায়গায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেমন একটা ভয় লাগিয়াছিল।

সুরুচি উপরের জানালাটিতে বসিয়া আন্‌মনে কত কি ভাবিতে থাকে। ভগবানের কাছে হাত জোড় করিয়া প্রার্থনা জানায়—রাখাল যেন তার মায়ের কাছে ফিরিয়া যায়; সেখানে সে যেন সুখে থাকে। এক একবার মনে করে—একদিন না একদিন তাহার ছেলে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিবে। সীতানাথবাবু কি তখন আর তাড়াইতে পারিবেন—কখনই পারিবেন না। বাড়ীতে আসিলে সে তখন রাখালের সহিত কথা কহিবে। কাহারও বাধা নিষেধ মানিবে না। তার মাতৃহৃদয় এ শাসনের জ্বালা সহ্য করিবে না। এমনি করিয়া সুরুচি নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিয়া মরে। সেই ত তাহার ছেলেকে তাড়াইল। কেন সে চেঁচামেঁচি করিয়া সকলকে জাগাইয়া তুলিল। ধীরে ধীরে রাখালকে বুঝাইলে, সে নিশ্চয়ই বুঝিত। সে যে তাহাকে যথার্থই আপনার মায়ের মত ভাল বাসিয়াছে। মা বলিতে সে যে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। নিশ্চয়ই সে তার আপনার মা বর্ত্তমানেও—মাতৃত্বে সুখ পায় নাই। সে যে আমার কাছে জ্বালা ভুলিতে আসিয়াছিল। আমি তাকে এ কি শাস্তি দিলুম! এই রকম কেবলি ভাবে আর মনে মনে দুঃখ করে।

ইহার মধ্যে কথাটা বেশ রূপ ধরিয়াই তাহাদের স্বজাতির ভিতর গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। কে রটাইল—তাহা কেহ বলিতে পারে

না। সুরুচির বিবাহের জন্য কতবার চেষ্টা হইল! বেশ বড় বড় ঘর হইতে সম্বন্ধ আসিল। কিন্তু সবি শেষে ভাঙ্গিয়া গেল। এর কারণ কি, সীতানাথবাবুর আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি এখন মেয়েকে কেমন করিয়া পার করিবেন, এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন। কেবলই সুরুচির মাকে বলেন—দেখ দেখি, কি হ'তে কি হ'ল! কি ভেবে রাখালকে বাড়ীতে মাষ্টার করে রাখলুম, আর শেষে কি হ'য়ে দাঁড়াল! রাখাল যে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে গেল। তোমার কথায় আমায় সে রাত্রে চুপ ক'রে থাকতে হ'ল; নইলে আমি রাখালকে চাপ্‌কে লাল করে দিতুম। ওঃ—আমার জাত, কুল সব যেতে বস্‌ল একেবারে।

সুরুচির মা শুনিয়া বলেন—কি কর্‌বে আর; অন্যায় ত কিছু চোখে দেখ নি? তাকে অমন করে মেরে ধরেই কি তোমার জাত, কুল আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠত! সে ত আরো কেলেঙ্কারির কথা।

একথা শুনিয়া সীতানাথবাবু চুপ করিয়া থাকিতেন, কিছু বলিতেন না। এত উদ্বিগ্নতা—তবু সুরুচিকে কোনও দিন কিছু তিনি বলেন নাই। পাছে অভিমানী মেয়ে সহ্য করিতে না পারিয়া ধিক্কারে কিছু করিয়া বসে—এই ভয়ে তাঁরা বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। কোন সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেলে, তাঁহারা সুরুচিকে শুনাইয়া বলিতেন—যাক্‌গে, ওর ঘরে মেয়ে দিত কে? আমার কি

মেয়ে খেতে পর্‌তে পার্‌ছে না? থাক্‌—সুরুচির বিয়ে দোব না। সুরুচি কিন্তু সব বুঝিতে পারিত। সে ত আর খুকী নয়।

এমনি করিয়া দিন যাইতে লাগিল। সীতানাথবাবু কোথাও মেয়ের কিছু ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। তিনি রাগের মাথায় একদিন গোপালকে সমস্ত খুলিয়া চিঠি লিখিলেন। সরোজিনী শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নীলিমা ভাবিয়া আকুল—এও সম্ভব? কেহই যেন কথাটা বিশ্বাসের মধ্যে আনিতে পারিল না। যাই হ'ক—যার মেয়ে তিনিই যখন লিখিয়াছেন, রাখালের আর কিছু পদার্থ নাই। সে লম্পট—চরিত্রহীন—মাতাল। তখন আর অবিশ্বাসের কি কারণ আছে?

সরোজিনী বুক বাঁধিলেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া—কি আর করিবেন! ছেলে যখন অমন হইয়া গেল লেখা পড়া শিখিয়া, তখন সকলি তাঁর কপালের দোষ।

নেপালের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। রাখালের সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া সে কেমন অবাক হইয়া গেল। হিসাব করিয়া দেখিল—রাখাল সীতানাথবাবুর বাড়ী ত্যাগ করিয়াছে আজ তিন মাস। নেপাল এক একদিন সহরে আসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া পায়ের লাঙ্গলে পথ চষিয়া ফেলিত। তাহার কেমন মন বলিত—এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে একদিন না একদিন রাখালের দেখা পাইবেই। রাখাল যে কলিকাতা ছাড়িয়া অন্য কোথাও গিয়াছে—এটা সে বিশ্বাস করিতে

পারিল না। এমনি করিয়া অনেক দিন সে রাস্তায় রাস্তায়, পার্কে পার্কে ঘুরিয়া মরিল ; কিন্তু রাখালের দেখা পাইল না।

সীতানাথবাবু গোপালকে আবার একখানা পত্র দিলেন, রাখালের যা কিছু বই, পত্র, কাপড়, জামা আছে—তা সব লইয়া যাইবার জন্য। গোপাল আর ভা'য়ের এই কেলেঙ্কারিতে সীতানাথবাবুর কাছে মুখ দেখাইতে পারিল না। তাই স্বয়ং না গিয়া নেপালকে পাঠাইয়া দিল।

নেপাল আসিয়া দাদার যা কিছু ছিল—সবই লইয়া গেল। কোন জিনিষটি নষ্ট হয় নাই। বইগুলো অতদিন পড়িয়াছিল, কিন্তু দেখিলেই মনে হয়, কে যেন যত্নের সহিত রোজই ঝারা পোঁছা করিয়া থাকে। সুরুচিরই এই কাজ। সে ভাবিত, রাখাল আবার ফিরিয়া আসিবে। তাহার বাপের কাছে নিশ্চয়ই ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু তার বুকের আশা বুকেই রহিল—রাখাল আর ফিরিল না।

নেপাল যখন রাখালের বই, কাগজ, জামা, কাপড় গুছাইয়া গুছাইয়া বাঁধিতেছিল—সুরুচি তখন দরজার পাশে দাঁড়াইয়া সকরুণ চক্ষে তাহা দেখিতে লাগিল। পাছে কেহ তাহার চোখের জল দেখিতে পায় ; দেখিতে পাইয়া আবার পাঁচ কানাকানি করে, এই ভয়ে সে চোখে জল আসিবামাত্র আঁচল দিয়া সারা মুখখানাই পুঁছিয়া মরে। যাক—এতদিনে সব ফুরাইল। রাখালের বই খাতাগুলা নাড়িয়াও সুরুচি একটু তৃপ্তি পাইত। আজ তার সেটুকুও

পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। নেপাল যখন চলিয়া যায়—সুরুচির মনে হইল, একবার দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসে—সে তার দাদার খবর কিছু পাইয়াছে কি না? কিন্তু ছুটিয়া যাইতে পারিল না। কে যেন তাহার পা চাপিয়া ধরিল। বুকের ভিতর তার সমস্ত হৃৎপিণ্ডটা কে যেন মোচ্ড়াইতে লাগিল। শূন্য ঘরের ভিতর একবার চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল। আর কোনওদিন সে ওঘরে ঢোকে নাই। ঢুকিবার আর প্রয়োজন কি? তাহার ওঘরে আর কি কাজ আছে? সকলি ত ফুরাইয়া গিয়াছে।

সরোজিনী রাখালের জন্য মন খারাপ করিয়া থাকিলে, নীলিমা তাঁহাকে সান্ত্বনা দেয় এই বলিয়া যে, রাখাল তাঁহার আসিবেই আসিবে। বেটাছেলে অমন একটা কুকাজ নয় করিয়া ফেলিয়াছে। তাতে আর কি হইয়াছে। অমন কত লোকে করে। নিশ্চয়ই বিদেশে কোথাও চাকরী করিতেছে। একেবারে টানা ছুটি লইয়া বাড়ী আসিবে। কোন চিন্তা নাই। সরোজিনী নীলিমার কথা শুনিয়া একটু ঠাণ্ডা হন। অপর্ণাও চুপ করে। কিন্তু হায়—যাহার জন্য এত কাণ্ড; তাহার দেখা কোথায় পাইবে? সে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। দীর্ঘ ছয় মাস—তবু রাখালের দেখা নাই। দিনের পর দিন যায়—তবুও রাখালের খোঁজ নাই মাসের পর মাস যায়—তবু রাখালের খবর নাই।

শনির দশা

দুটি মায়ের প্রাণ—সরোজিনীর আর সুরুচির—রাখালের জন্য কাঁদিয়া মরে। সরোজিনী খানিক মৃত স্বামীর জন্য খানিক নিরুদ্দেশ রাখালের জন্য গলা ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। কিন্তু সুরুচির চোখের জল অন্তরেই ঝরে। কেহ তা দেখিতে পায় না।

—

নয়

সীতানাথবাবুর বাড়ীখানা ঠিক সদর রাস্তার উপর নয়। সদর রাস্তা হইতে একটু সরু গলির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। সীতানাথ-বাবুর বাড়ীর ঠিক সম্মুখের বাড়ীখানা ভাড়াটে বাড়ী। বাড়ীর মালিক অবশ্য সীতানাথবাবু নন। সে অন্য একজন। ও পাড়ায় তিনি থাকেন না। বাড়ীখানা বড়; পূর্ব্বে কোন জমিদার কিছুদিন হাওয়া বদলাইতে আসিয়া ভাড়া লইয়াছিলেন। এখন প্রায় তিন মাস ধরিয়া খালি পড়িয়া আছে। অত বড় বাড়ী কে আর চট্ করিয়া ভাড়া লইবে।

হঠাৎ সেদিন সকাল বেলায় পাড়ার সকলে জানিল, বাড়ীখানা ভাড়া হইয়া গিয়াছে। কে লইয়াছে—তাঁহার নাম কেহ জানিতে পারে নাই। তবে সকলে অনুমান করিল, নিশ্চয় এবার যে আসিতেছে, সেও মস্ত বড় জমিদার হইবে। জিনিষপত্র—খাট্, আল্‌মারি, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি আসবাবপত্রে বাড়ীখানা ভর্ত্তি হইয়া গেল। অনবরত লোক সে সব বহিয়া বহিয়া আনিতেছে। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে বলে—বালিগঞ্জ হইতে আসিতেছি। মালিকের নাম কি—এ কথার উত্তর কেহ দিতে পারে না। কাজে

কাজেই পাড়াপ্রতিবাসীর একটা কৌতূহল জাগিয়া রহিল। যথা-সময়ে চাকর, ঝি, দরোয়ান বাড়ীতে কাজে লাগিল। মনিবেরাও আসিয়া পড়িলেন। যিনি কর্ত্তা, তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারিল না। নাম শুনিয়া ও চেহারা দেখিয়া সীতানাথবাবুই কেবল বুঝিতে পারিলেন, লোকটি সেই রাখাল ছাড়া আর কেহ নয়। সকলে শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সুরুচির প্রাণ আনচান্ করিতে লাগিল; একবার ছুটিয়া গিয়া সে দেখিয়া আসে তাহার ছেলে কেমন করিয়া এমন রাজা সাজিল। মনে মনে তার খুব আনন্দ। যাক্—ভালই হইল। ভগবান তাহার আশা পূর্ণ করিয়াছেন। তাহার সাধের ছেলেকে তাহার চোখের সম্মুখেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। নাই বা তাহার সহিত কথা কহিতে পারিল, দিনের মধ্যে ছেলেকে একবার চোখে দেখিতে পাইবে ত—তা হলেই হইল। সীতানাথ বাবু প্রবীণ লোক। তিনি সহজে থামিলেন না। ভিতর ভিতর চাকর দরোয়ানের কাছে খোঁজ লইতে লাগিলেন। যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহার সারাংশ এই।

রাখাল এক পতিতার মেয়েকে টাকার লোভে পড়িয়া বিবাহ করিয়াছে। রাখালের নামে কলিকাতা সহরে দু দুখানা বাড়ী ও নগদ বেশ মোটা টাকা মেয়ের মা লিখিয়া দিয়াছেন। রাখাল তাহা পাইয়াই এই সমাজনিন্দিত কাজ করিয়াছে। রাখালের পরিবার ও শাশুড়ী ওই বাড়ীতেই থাকেন। সীতানাথবাবুর কেমন

ভয় হইল। রাখাল সেই দূর বালিগঞ্জ হইতে কেন এখানে উঠিয়া আসিল। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখেই বা বাড়ী ভাড়া লইল কেন? তাঁহার অবিবাহিতা মেয়ে রহিয়াছে—তাঁহার কিছু অনিষ্ট করিবে না ত? অনেকদিনই গলির মুখে সীতানাথবাবুর সহিত রাখালের চোখোচোখি হইয়াছিল। সীতানাথবাবু কথা কহিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন কিন্তু রাখাল মুখ ফিরাইয়া লইত। তিনি গতিক ভাল নয় বুঝিয়া, তাঁহার পরিবারকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যেন, সুরুচি কখনো ওদের বাড়ী না যায় আর ওদের বাড়ীর ঝি টি এলে যেন তাদের সহিত সুরুচি কথাবার্ত্তা না কয়। সুরুচির উপর সেকারণ কড়া নজর পড়িল। সুরুচির মাও বুঝিলেন, দেখিলেনও সব; ভয়ে তিনি সারা হইয়া যাইতে লাগিলেন। কেবল দিনরাত সীতানাথবাবুকে তাগিদ দেন, যেমন করেই হ'ক—তুমি শীগ্‌গীর মেয়ে পার কর। এতে আমায় পথে বস্‌তেও যদি হয়—সেও ভাল। আমি আর অত বড় মেয়ে ঘরে রাখ্‌ব না। সীতানাথ বাবুও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না—মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য আরো উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

পাড়ার কাহারও সহিত রাখাল আলাপ পরিচয় করে নাই। সে আলাপ পরিচয় চায়ও না। যখন বাহির হয় তখন তাহার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ সাহস করিয়া কথা কহিতে পারে না। সকলেই পাশ কাটিয়া সরিয়া যায়। রাখাল অত টাকার মালিক হইয়াছে

বলিয়া যে তাহার চালচলন কিছু বদ্‌লাইয়াছে—তাহা নহে। তাহার চালচলন পূর্ব্বের মতই সাধারণ আছে। সেও ভিতর ভিতর খবর পাইয়াছে, সুরুচির বিবাহ এখনও হয় নাই। একবার মনে করে, সুরুচির কাছে গিয়া—দুটো কথা কহিয়া আসে; কিন্তু সে রাত্রের ব্যাপার স্মরণ করিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকে। চাবুক লাগানর কথাটা সে এখনও ভোলে নাই। তাহার মনে সেটা বেশ সজাগ আছে। মদ সে এখনও খায়; কিছুমাত্র কমে নাই; উপরন্তু পানের মাত্রা বেশ বাড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া তাহার মুখ ধোওয়া আর চা পান ছাড়া অন্য কোন কাজ নাই। তাহার পর একটু খবরের কাগজে চোখ বুলাইয়া স্নানাহার; পরে দিবানিদ্রা। সে ঘুম ভাঙ্গিলেই তাহার সঙ্গী মদ। তখন থেকেই মদ খাওয়া চলে। থামে—যতক্ষণ না রাত্রে বেশ টলিয়া ঢলিয়া পড়ে।

এখানে আসিয়া বন্ধুবান্ধবদের কাহাকেও খোঁজ করে নাই। কেহ দেখা করিতে আসিলে, দু'চার কথায় তাহাকে বিদায় করিয়া দেয়। তেমন আলাপ পরিচয়ে আর আগ্রহ প্রকাশ করে না। একদিন সুধীর, হরেন ও শম্ভু তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল।

তখন রাখাল দিবানিদ্রা শেষ করিয়া, মদের বোতল লইয়া বসিয়াছে। চাকর আসিয়া জানাইল—তিনজন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়াছেন।

রাখাল মুখখানা বিকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভদ্রলোক ?

চাকর কহিল—হাঁ বাবু।

রাখাল বলিল—ওপরে নিয়ে এস।

একটু পরেই সুধীর, হরেন ও শম্ভু ঘরে আসিয়া ঢুকিল। রাখাল বন্ধুদের দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। সকলের দিকে চাহিয়া বলিল—এস ব'স।

মেঝের উপর দামী জাজিম পাতা। তার উপর বিছানা। ঘরময় তাকিয়া ছড়ান রহিয়াছে। তাহারি এক কোণে রাখাল বসিয়া মদ খাইতেছে। রাখালের কথা শুনিয়া ও ভাবগতিক দেখিয়া কেহই বসে নাই। রাখাল সুধীরের মুখের দিকে তাকাইয়া আবার বলিল—কি হে, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ আর ঘরে একটু বস্‌তে চাইছ না যে? আমার ঘরে বস্‌লে কি তোমাদের—

রাখাল ইচ্ছা করিয়াই কথাটা শেষ করিল না। কি বলিতে যাইতেছিল বন্ধুরা তাহা বুঝিতে পারিল। সুধীর আর দাঁড়াইয়া রহিল না। সে বসিতেই, হরেন ও শম্ভু জড়সড় হইয়া পাশাপাশি বসিয়া পড়িল।

রাখালের ইসারায় চাকর ঘর হইতে চলিয়া গেল। তারপর গোটা দুই তাকিয়া বন্ধুদের দিকে ঠেলিয়া দিয়া রাখাল বলিল,—এবার ত তোমাদের সমাজ, জাত, কুল, মুখ সবি রক্ষে হয়েছে ?

সুধীর কোন উত্তর দিল না। রাখাল আবার বলিল, এবার ত আর আমি তোমাদের সমাজে নেই। বোধ করি এবার যা কর্‌ব—তোমার সমাজ আর কথা বল্‌বে না। গেল—গেল—চীৎকার আর উঠ্‌বে না। কেমন ভাই—বল—কথা কইছ না যে? চোখে দেখ্‌তেই পাচ্ছ—আমি মাতাল, মদ খাচ্ছি। আর তোমাদের নেপথ্যে কি করিছি, শোন। এক বেশ্যার মেয়ে বিয়ে করেছি। কিসের জন্য জান? এই কেবল টাকা—টাকার জন্যই। আর কারোর কেয়ার করি না। তোমাদের ওই পেঁকো সমাজের ভেতর ত আর নেই—তখন কেয়ার করাটা দরকার কি হচ্ছে। বলিয়া একটু চুপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তারপর, তোমাদের খবর সব ভাল ত?

তাহাতেও কোন প্রত্যুত্তর নাই। রাখাল নক্সা করা কাঁচের গেলাশে মুখ দিয়া দু চুমুক মদে গলাটা ভিজাইয়া লইল। মুখটা একটু বিকৃত করিয়াই কহিল—দেখ, তোমাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমরা যদি না আমায় সেদিন তেমন করে শোনাতে; যদি না আমি ধিক্কারে আত্মহত্যা কর্‌তে যেতাম; তাহলে হয়ত এ সৌভাগ্য আমার ভাগ্যে আস্‌ত না। এ সব যা পেয়েছি ভোগ কর্‌ছি—একরকম তোমাদেরি কৃপায়। সেই বাঙ্‌লা সাপ্তাহিক কাগজখানা একবার দেখ্‌বে? এখনো বিজ্ঞাপনটার নীচে তেমনি লেখা আছে—'রাখালের এ বিয়ে করা উচিত'। ঠিক

কথা—রাখালের ত করা উচিতই ; বন্ধুবান্ধবেরা রাখালকে ষ্টাডি করে জেনেছিল, রাখাল অরক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তার ওপর—নাঃ থাক্। দেখ ভাই—বাঁচলুম। আর কথার ধারধারি নেই। আমাদের রাখাল কি কর্‌লে—কি কর্‌লে ; ওই বুঝি মুখ পোড়ালে ; ওই বুঝি আইবুড়ো মেয়েটাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে রাস্তায় বার করে আন্‌লে ; এ সব—এ সব কথা আর শুন্‌তে হবে না। এখন যাদের নিয়ে মেতেছি, তারা ওই সুধীর, শম্ভু, হরেনের কথায় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌বে না। তোমাদের সমাজকে যারা ভাঙা মাটির হাঁড়ির মত পায়ে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে—তাদের সঙ্গ এবার নিয়েছি—বড় দুঃখে—বড় শোকে—বড় অনুতাপে।

শেষের কথাগুলো বলিতেই রাখালের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি হাতের রুমালখানা দিয়া মুখখানা পুঁছিয়া লইল। অন্তরের ভাবটা কাহাকেও জানিতে দিল না।

একটু কিছু বলিতে হইবে—নহিলে ভাল দেখায় না, তাই সুধীর বলিল—তা, তুমি এমন কাজ কর্‌লে শেষে ?

রাখাল হাসিয়া উত্তর দিল—কেন কর্‌ব না ? আমার কপালে যে রাজভোগ লেখা আছে—কে তা খণ্ডাবে বল ?

সুধীর আবার জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এ পাড়ায় বাড়ী ভাড়া কর্‌লে কেন ?

রাখাল বন্ধুদের একটু নাচাইতে চায়। সে অমনি বলিল বেশ

মতলববাজেরই মত, বুঝ্‌তে পারছ না? মেয়েটার যে এখনও বিয়ে হয় নি শুনলুম; তাই থাকতে পারলুম না। বালিগঞ্জ থেকে ছুটে এখানে এলুম, তার বিয়েটা কেবল দেখ্‌বার জন্যেই।

সকলের মুখ চূণ হইয়া গেল। কেহ কিছু আর বলিতে সাহস করে না। সবাই চুপ। এমন সময় চাকর একখানা বড় ট্রেতে তিন খানা ডিসে খাবার সাজাইয়া আনিল। সুধীর তাহা দেখিয়া সঙ্কোচের সহিত বলিল—না, না—আমরা কিছু খাব না। এ সব কেন?

রাখাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মুখের আকার অত্যাচারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যেমন রাখালের মুখে একটা লালিত্য খেলা করিয়া বেড়াইত—তাহা আর নাই। তাহার হাসি শুনিয়া সকলের মনে হইল, শ্মশানের কান্নাও এর চেয়ে ভাল।

রাখাল বলিল—তা আমার বাড়ী খাবে কেন? ঠিক কথা। তোমরাই না সেই বিয়ের বিজ্ঞাপনটায় আমার অসাক্ষাতে—আমার নাম লিখে মতামত প্রকাশ করেছিলে? আজ সেই তোমরাই আমার বাড়ীতে জল খেতে পেছুচ্ছ। কি আশ্চর্য্য! তখন বুঝি ভেবেছিলে, রাখালের আর এ সাহস হবে না। কিন্তু দেখ—রাখালের একটা ভদ্রলোকের মেয়ের মাথা খাবার প্রবৃত্তি হয় নি তাকে 'মা' বলে ডেকে; তার চাইতে এ কাজটা সে বেশ হাসিমুখেই করতে পেরেছে। দূর ছাই—কি বক্‌ছি! চাকরের দিকে তাকাইয়া

হুকুম করিল—কি আর কর্‌বে দাঁড়িয়ে থেকে ; নিয়ে যাও সব। বাবুরা কিছু খাবেন না।

মনিবের হুকুম চাকর মানিল। বন্ধুরা আর বেশীক্ষণ বসিল না। যাইবার সময় সুধীর কেবল বলিল—তুমি ভাই শিক্ষিত হয়ে এ.কি কর্‌লে ?

রাখাল তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—একটা নতুন কিছু। আমার শিক্ষার বাহাদুরী ওই খানে।

সুধীর কহিল—আমাদের সব দেখে শুনে বড়ই দুঃখ হয়।

রাখাল হাসিয়া বলিল—সত্যি ?

একটু পরেই সকলে বিদায় লইল। আর কোনওদিন এমন-ভাবে তাহারা রাখালকে দর্শন দিয়া আপ্যায়িত করিতে আসে নাই।

রাখালের পরিবার ঊষা স্কুলে পড়ে। প্রত্যহ স্কুলের গাড়ী আসে—তাহাতে করিয়া সে স্কুলে যায়। বাড়ী আসিবার তাহার ঠিক নাই। বন্ধুবান্ধব তার অনেক। বাড়ীতে ফিরিতেই তাহার সন্ধ্যা হইয়া যায়।

রাখালের সহিত ঊষার বেশ বনিবনাও হয় না। ঊষা রাখালকে ঘৃণা করে—সে মাতাল বলিয়া। তা ছাড়া সে চায় না অমন আবদ্ধ হইয়া থাকিতে। মায়ের চরিত্রের ছাপ তাহার উপর বেশ পড়িয়াছে। মা হাজার চেষ্টা করিলে কি হইবে ? আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতার আওতায় ও নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সে বেশ

ফুলটির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানা ভৃঙ্গের সহিত সে আলাপ চায়; নহিলে তাহার মন তৃপ্ত হয় না। তাহার বাড়ীতে পুরুষমানুষ আসে অনেক। পূর্ব্বে রাখাল জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, ওরা সবাই আপনার লোক। কেহ পড়াইতে আসে; কেহ গান শিখাইতে আসে; কেহ সম্পর্কে বন্ধু—কেহ সম্পর্কে ভাই। প্রথম প্রথম রাখাল একটু খিট্ খিট্ করিয়াছিল; শেষে দেখিল, তাহাতে উষা বিরক্ত বই খুসী নয়। সেও তাই মন প্রাণ ঢালিয়া মদ খাইয়া জ্বালা ভুলিতে থাকে; আর বড় একটা সে উষাকে কিছু বলে না। একটু জোর করিলেই উষা মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিত—এতদিনের অভ্যাস সে ছাড়িতে পারিবে না। অত শাসন মানিয়া চলিলে তাহার কোমল অন্তর ভাঙিয়া পড়িবে।

উষার মা দেখিল, এ মিলন ভাল হইল না। মেয়ের সুখের জন্য তাহার এমন ব্যবস্থা করা। মেয়ে যদি তাহা না চাহিল—তবে আর সে কি করিবে। তাহার আর কি; হাতে যাহা আছে—একাকী কাশী গিয়া থাকিলে তাহার জীবনে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। ইচ্ছাও আছে তাই। মেয়ের একটা চিরস্থিতি না করিয়া যাইতে পারিতেছে না।

উষার ভাবগতিক দেখিয়া তাহার মা উকিল ডাকিয়া কেবল গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিল, রাখালকে যা লিখিয়া দিয়াছে তাহা ফিরাইয়া লয় কেমন করিয়া। রাখাল তাহা বুঝিতে পারে নাই।

একদিন রাখাল নিজের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। কোনওদিন সে সুরুচিকে দেখিতে পায় নাই। আজ সেজন্য সে এক একবার সীতানাথবাবুর বাড়ীর উপরের জানালার পানে থাকিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেছে। ইচ্ছাটা—যদি কোনও ফাঁকে সুরুচিকে একবার দেখিতে পায়। সীতানাথবাবু ঘর হইতে ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। কেমন হঠাৎ তাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিল। চুপ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তর্ তর্ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। রাখাল ঠিক সেই সময় উপরের দিকে মুখ তুলিয়াছে। সীতানাথবাবু বেগে আসিয়া রাখালকে এক ধাক্কা দিয়া বলিলেন, এ তোমার কি আক্কেল! ভদ্রপাড়ায় এসে এক অভদ্র সংসার নিয়ে ত বাস করছ। আমরা কেউ তাতে কিছু বলিনি। আমার মেয়ের প্রতি অমন দৃষ্টি দিচ্ছ কেন? তুমি কি চাও—আমরা তোমার জন্যে এপাড়া থেকে উঠে যাব?

ধাক্কাটা খাইয়া রাখাল কেমন সামলাইতে পারিল না—পড়িয়া গেল। হাঁকাহাঁকি চেঁচামেচিতে পাড়ার সকলে আসিয়া জড় হইল। সকলেই সীতানাথবাবুর হইয়া বলিতে লাগিলেন। রাখাল একা—রাখালের দিকে কেহ নাই। থাকিবেই বা কে—তাহার চরিত্রের কথা এখন সকলেই জানিয়াছে। রাখাল পড়িয়া যাইতে তাহার বাড়ীর দরোয়ান আসিয়া রাখালকে তৎক্ষণাৎ তুলিয়া ধরিল। রাখাল দেখিল—তাহার মনে কোন পাপ না থাকিলেও,

কাজটা অন্যায় হইয়াছে। সে একথাটা চাপা দিয়া, বেশ জোর করিয়া সীতানাথবাবুকে বলিল—চোর, জোচ্চোর, আমাদের সর্ব্বনাশ করেছো তুমি। আমার ভা'য়েদের—মাকে পথে বসিয়েছো। আমার বাপের বাড়ী বেচিয়েছো। নেমকহারাম—বেইমান—মনে করেছো আমি সব ভুলে গেছি। আমি কিছু ভুলিনি। আমাদের টাকা দাও। আমি আর ছেড়ে কথা কইব না। তোমাকে আজ বল্‌ব বলেই সকাল থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি।

সীতানাথবাবু সেকথা ঘুরাইতে চান। তিনি রাগিয়া বলিলেন—ও টাকার কথা পরে। তুমি আমার মেয়ের দিকে অমন তাকাচ্ছিলে কেন?

রাখাল উত্তর দিল—বেশ করিছি। তোমার ইচ্ছে হয় পুলিশ কেশ করগে। আমার বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমি চতুর্দ্দিকে চোখ চাইব—তুমি তা বন্ধ কর্‌তে পারবে? ভাল না লাগে—জান্‌লা বন্ধ করে রাখগে।

পাঁচজনে আর কি বলিবে। পয়সাও'লা লোকের সহিত কেহই বিবাদ বাঁধাইতে রাজী নয়; হউক সে মাতাল—হউক সে চরিত্রহীন। রাখালের মেজাজ দেখিয়া, এক এক করিয়া সকলে সীতানাথবাবুকে সাবধান হইতে বলিয়া চলিয়া গেল। সীতানাথবাবু বিমর্ষ মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাখাল যখন দেখিল, অন্য কেহ নাই; তখন সীতানাথবাবুকে শুনাইয়া বলিল, সীতানাথবাবু এ

আর সে রাত্রি নয় যে, ঘোড়ার চাবুক লাগাবে। আমিও আর তোমার ঘরে সে মাত্‌লাম করিনি যে, নীরবে সেদিনের মত সেকথা সহ্য কর্‌ব। যাক্‌ ও কথা। আমাদের টাকার কি হবে? কবে দেবে? আমি ঠিক্‌ নালিশ কর্‌ব। অকৃতজ্ঞ—চামার। আমি এরকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করতে চাই না। তুমি বেশ ভেবে চিন্তে আমায় উত্তর দিও।

রাখাল এই বলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। সুরুচি ও সুরুচির মা উপরের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিলেন ও শুনিলেন। উষা ও তাহার মা ব্যাপারটা কিছু না বুঝিতে পারিলেও অনুমানে একটা ধারণা ঠিক করিয়া লইল। সীতানাথ-বাবু মহা ভাবনায় পড়িলেন। তিনি কোন্‌ দিক সাম্‌লাইবেন। মেয়ের ব্যবস্থা করিবেন, না রাখালের সহিত মাম্‌লা করিবেন।

রাখালের বাপের মৃত্যুর পর যখন বাড়ী আর রহিল না—পাওনাদার বেচিয়া লইল, তখন রাখাল একদিন বাপের কাগজ-পত্র ঘাঁটিতেছিল। সীতানাথবাবু যে টাকা ধার লইয়াছিলেন; সেটা কোন কাগজে স্পষ্ট লেখা না থাকিলেও রাখাল আভাষে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। গোপালকে একথা জানাইয়াছিল। কিন্তু গোপাল ঠিক বুঝিল না। পাছে একথা বলিলে পিতৃবন্ধুর অপমান করা হয়, এই ভয়ে কেহ আর সীতানাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করে নাই। রাখালের সেটা মনে ছিল। ইচ্ছা ছিল না—একথা লইয়া

সীতানাথবাবুকে কিছু বলে। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া থাকিতে পারে নাই—তাই এমন করিয়া শাসাইয়াছিল।

সেদিন সীতানাথবাবু এটর্ণির সহিত পরামর্শ করিয়া জানিলেন, রাখালের হুম্‌কি মিথ্যা। সে নালিশ করিয়া কিছুই করিতে পারিবে না। এমন কিছু লেখাপড়া নাই, যাহাতে সীতানাথবাবু যে রাখালের বাপের কাছ হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন—একথাটা প্রমাণ হইবে। রাখালও বুঝিয়াছিল—নালিশ করিয়া কিছু হইবে না। তবে সে সুযোগ যখন পাইয়াছে—বলিতে ছাড়ে কেন? তাহাকেও ত ঘোড়ার চাবুক লাগায় নাই; কিন্তু বলিতে কসুর করিয়াছিল কি?

রাখাল তারপর কত চেষ্টা করিল—কোনওদিন সে সুরুচিকে চোখে দেখিতে পাইল না। সে এখন পূর্ণ মাতাল, ব্যাভিচারী হইয়াছে বটে; কিন্তু সুরুচির স্নেহ, আদরের কথা আজও ভোলে নাই। আজও তাহার মাথা সুরুচির পায়ে না হ'ক, তার মায়া, ভালবাসার চরণে শত শতবার নত হয়। এখনও সে এতটা অপদার্থ হয় নাই যে, সে সমস্ত মন হইতে পুঁছিয়া ফেলিবে। সুরুচির বিবাহ হয় নাই, রাখালই যে তাহার কারণ—সে এটা বেশ বুঝিয়াছে। কথাগুলো ভাবিলেই তার প্রাণটা কেমন করিয়া ওঠে। সুরুচির কি হইবে—তাহার জন্য কি তাহার জীবনটাও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ওঃ—সে কি পাষণ্ড! কেন এমন করিল! নিজের ত

যথেষ্ট সর্ব্বনাশ করিয়াছে। একটা অনূঢ়া মেয়েরও এমন করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া রাখিল ; এই সকল ভাবিতে ভাবিতে যখন তাহার মন তিক্ত হইয়া ওঠে, তখন সান্ত্বনা দেয় মদ। মদ খাইয়া মাথা আরো গরম হইয়া যায়। তাই রাগের মাথায় যা' তা' চীৎকার করিয়া মরে।

সম্প্রতি তাহার এক ব্যাধি সুরু হইয়াছে। প্রায়ই ঘর হইতে সীতানাথবাবুকে গালাগালি দেয়। সীতানাথবাবুর বাড়ীর সকলেই তাহা বেশ শুনিতে পায়। সুরুচির রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যায়। রাখালের উপর তার এমনি ঘৃণা জাগিয়াছে যে, যদি কেউ কোনও দিন তাহার কাছে তাহার ছেলের কথা বলিতে আসে, সে অমনি রাগিয়া আগুন হইয়া ওঠে।

রাখাল এইবার পাগল হইয়াছে ; যদিও না হইয়া থাকে ত শীঘ্রই হইবে, এটা বাড়ীর সকলে বুঝিতে পারিল। উষা তাহার মায়ের সহিত এই লইয়া একটা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। রাখাল এখন তাহাদের আপদ হইয়াছে। তাহাকে দূর করিতে পারিলেই তাহারা বাঁচে। মেয়ের আবার নূতন ব্যবস্থা করিয়া সুখ দেখিয়া যাইবে—এই ভাবিয়া উষার মায়ের মনের আশা আবার নূতন করিয়া জাগিতে লাগিল।

দশ

রাখাল প্রথম উষাকে বিবাহ করিয়াই মায়ের কাছে গিয়াছিল। সরোজিনীকে ভরসা করিয়া কোন কথা খুলিয়া বলিতে পারে নাই। কিছু ফল, মিষ্টি পয়সা দিয়া কিনিয়া লইয়া গিয়াছিল। সরোজিনী ভিতরের ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। আদর করিয়াই রাখালের সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। সীতানাথবাবুর বাড়ীতে যে কাণ্ড করিয়া পলাইয়াছিল, সে কথা আর কেহ তুলিল না। সকলেই ধরিয়া লইল, রাখাল অজ্ঞানে করিয়া ফেলিয়াছে—এখন নিশ্চয়ই তাহার জন্য অনুতপ্ত।

রাখাল মধ্যে মধ্যে বাড়ী যাইত। অপর্ণার জন্য নীলিমার জন্য ভাল ভাল সাড়ী ও জামা কিনিয়া কিনিয়া আনিতে লাগিল। সরোজিনী জিজ্ঞাসা করেন—হ্যাঁ রে, রাখাল, এত সব জিনিষ আনিস্, কোথায় পয়সা পাস্? চাক্‌রী করিস্ বুঝি? তা আমায় বল্ না—কেন লুকিয়ে রেখেছিস্? রাখাল কিছুই বলিতে পারে না। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কথা ঢাকিয়া চলে। সরোজিনীও আর বেশী জিদ্ করিতেন না।

একদিন সরোজিনী বলিলেন—রাখাল, এখন ত প্রায়ই এখানে আসা যাওয়া করিস্। তা আমার কাছেই থাক্ না। 'থাক্‌ব'—

'থাক্‌ব'—করিয়া রাখাল দিন কাটাইয়া দেয়। মনের কষ্ট মনেই চাপিয়া রাখে। মাকে বলে, মা, অপর্ণার বিয়ের ব্যবস্থা কর। আমি টাকা জোগাড় করে দোব—যেখান থেকে পারি। সরোজিনী শুনিয়া একটু আনন্দিত হন। নীলিমা রাখালকে একটা বিবাহ করিবার জন্য পেড়াপিড়ী করে; রাখাল কিন্তু তাহাতে মোটেই কান দেয় না। রাখালের কেবলি ভয়—এই বুঝি সকলে ধরিয়া ফেলিল, রাখাল এক পতিতার মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। কোথায় আছে—জানিতে চাহিলে, রাখাল বলে, থাক্‌বার ঠিক নেই। যেখানে হ'ক্ এক জায়গায় পড়ে থাকি।

রাখাল এমন সময় আসে যে সময় গোপাল বাড়ীতে থাকে না। পাছে গোপাল জেরা করিয়া সকল খবর জানিয়া লয় এই ভয়ে সে গোপালকে এড়াইয়া চলে। রাখাল তাড়াতাড়ি অপর্ণার বিবাহ দিতে আর সরোজিনীকে কাশী পাঠাইতে চায়। এমন কাছাকাছি মাকে রাখিলে চলিবে না। সুদূর তীর্থে মাকে পাঠাইতেই হইবে। তাহার এ বিবাহ ব্যাপার সরোজিনীকে আর জানিতে দিবে না—এই তার উদ্দেশ্য।

নেপাল স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছিল। রাখাল আবার তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিল। কিন্তু নেপালের লেখাপড়ায় আর মন বসিল না।

রাখালের এক একবার ইচ্ছা হয়—একদিনেই সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলে। প্রত্যেকের নামে নামে টাকা জমা রাখিয়া দেয়।

সে বুঝিয়াছিল এ দেহ আর বেশী দিন থাকিবে না। এ পাপের অবসান তাহার হইয়া আসিতেছে। টাকাকড়ির ব্যবস্থা শীঘ্র করিতে পারিত না—গোপালের ভয়ে। একেবারে এত টাকা কোথায় রাখাল পাইল—এ সন্ধান গোপাল ঠিক বাহির করিয়া আনিবে। তাই রাখাল সব দিক বাঁচাইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইত।

ইহার পরই রাখাল সীতানাথবাবুর বাড়ীর সম্মুখেই উঠিয়া আসিয়ছিল। সীতানাথবাবু মধ্যে একদিন গোপালের আফিসে গিয়া গোপালকে রাখালের কীর্ত্তির কথা সব জানাইয়া দিল। গোপালের মুখ হইতে সরোজিনী শুনিলেন। শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এতদিন রাখাল তাহা হইলে তার মাকে ঠকাইয়া আসিয়াছে। পেটের ছেলে হইয়া সে মায়ের ইহকাল পরকাল সবই নষ্ট করিয়া দিল। বেশ্যার টাকা তাঁহাকে লইতে হইয়াছে। যে সকল ফল, মিষ্টি আনিত—সরোজিনীও ত তাহার কিছু কিছু খাইতেন। হায়—হায়—জাত, ধর্ম্ম বুঝি তাঁরও গেল! রাগে, দুঃখে সরোজিনী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে বসিলেন।

পরদিন আপিসে যাইবার সময় গোপাল নিজের পরিবারকে চেঁচাইয়া বলিয়া গেল, যা'তে সরোজিনীও কথাটা শুনিতে পায়;—দেখ, রাখাল এলে তার দেওয়া কাপড়, জামা, গহনা যা কিছু তার

সব সাম্‌নে ধরে দেবে। আমি ফিরে এসে তার দান, বেশ্যার কৃপায় এককণাও যেন বাড়ীতে না দেখ্‌তে পাই। যদি তোমরা কাপড়, গহনার মায়া না ছাড়্‌তে পার, আমি আর এ বাড়ীতে ঢুক্‌ব না। যা' ভাল বুঝ্‌বে কর্‌বে। মাকে বোলো—আমি আর সে ভা'য়ের মুখ দেখ্‌তে চাই না।

রাখালের আসিবার নির্দ্দিষ্ট দিন কিছু ছিল না। কিন্তু সেদিন দুপুর বেলায় রাখাল এক রাশ জিনিষপত্র কিনিয়া আনিয়া হাজির। যেদিন মায়ের কাছে আসিত সেদিন মদটা আর খাইত না। বাড়ী ফিরিয়া যা হয় করিত।

'মা'—'মা'—করিয়া একেবারে রাখাল উপরে উঠিয়া আসিতেছে। সরোজিনী তাহার গলা শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। মায়ের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া রাখাল একটু থমকিয়া দাঁড়াইল।

সরোজিনী বলিলেন, রাখাল, তুমি আমার পেটের ছেলে হয়ে আমার জাত, ধর্ম্ম সবি খেয়েছ। আমি সমস্ত শুনেছি। তুমি টাকার লোভে এক খান্‌কীর মেয়ে বিয়ে করেছ। বেশ—সেইখানে থাক' গে। মরি বাঁচি আমায় আর দেখ্‌তে আস্‌তে হবে না। ভগবান করুন, যেন তোমার মুখ আর আমায় দেখ্‌তে না হয়। বড় দুঃখেই আমি এই কথাগুলো বল্‌ছি। এতদিন মাকে ভক্তি দেখাতে এক নীচ খান্‌কীর প্রসাদ এনে! উঃ—আমায় যে

প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে রে। ওরে দুষ্‌মন্—তোকে আঁতুড়ে কেন নুণ খাইয়ে মেরে ফেলি নি। তা হলে আমায় এত জ্বল্‌তে পুড়্‌তে হত' না। আমি বিধবা—আচারে থাকি। আমার এ সর্ব্বনাশ কেন কর্‌লি? তোর পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে মর্‌ব। আমি আজই মর্‌ব। তোর জন্যেই মর্‌ব।

এই বলিয়াই সরোজিনী রাখালের পায়ের কাছে দুম্ দুম্ করিয়া মাথা ঠুকিতে লাগিলেন আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—ওঃ—কি সর্ব্বনেশে ছেলে গর্ভ ধরেছিলুম গো! আমার গর্ভ তখন নষ্ট হয়ে যায় নি কেন? আমি যে শান্তিতে থাক্‌তে পারতুম্।

মুহূর্ত্তেই সরোজিনীর কপাল হইতে রক্ত ছুটিল। মুখখানা তাঁহার একেবারে রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল। তখনো বিরাম নাই। তখনো দুম্ দুম্ করিয়া মাথা ঠুকিতেছেন। রাখালের একবার মনে হইল সরোজিনীকে ধরে, কিন্তু তাঁর কথাগুলো শুনিয়া তাহার হাতে আর বল আসিল না। সে কাটের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া অপর্ণা ও নীলিমা দৌড়িয়া আসিয়া সরোজিনীকে ধরিয়া ফেলিল। মাথা ঠুকিতে আর দিল না। সরোজিনী স্থির থাকিতে পারেন নাই—কেবলি মাথা নাড়িতে লাগিলেন। পরনের সাদা থান কাপড়খানা রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। নীলিমা ও অপর্ণা সবই জানিত, সেজন্য আর চেঁচামেঁচি করিল না। নীরবে তাহারাও কাঁদিতে লাগিল।

নেপাল তখন বাড়ী ছিল না—কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। নীলিমা তাড়াতাড়ি সরোজিনীর মুখ ও কপাল জল দিয়া ধুইয়া দিতে লাগিল। সরোজিনী তাহার হাত ঠেলিয়া বলিলেন,—ছাড়, বউমা। পরে অপর্ণাকে ডাকিয়া বলিলেন, অপু, অপু, কাপড়, জামা, গয়না যা কিছু ও মুখপোড়ার জিনিষ—ওকে দিয়ে দাও। ও আমার ছেলে নয়; ছেলে নয়—কালশমন। আমার ঘরে ওর কিছু রেখো না। আমি তা'হলে গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব।

এই কথা বলিয়াই সরোজিনী কেমন ধুঁকিতে লাগিলেন। তখনো কপাল হইতে অজস্র রক্ত ছুটিতেছে। রাখাল আর দেখিতে পারিল না। সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিল। অপর্ণা পিছন হইতে ডাকিল, মেজদা, নিয়ে যাও সব; দাঁড়াও—যেওনা।

বেশ রাগান্বিত ভাবেই রাখাল কহিল, ফেলে দিগে যা।

অর্ণপা বলিল—না, তুমি নিয়ে যাও। বড়দা বলে গেছে, তোমায় ফিরিয়ে দিতে সব। নইলে রাত্রে এসে ভীষণ রাগারাগি কর্‌বে।

রাখাল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—বেশ, নিয়ে আয়।

অপর্ণা একে একে কাপড়, জামা, সেন্ট, সাবান, পুতুল, সেপ্‌টিপিন, গলার হার আরও অনেক কিছু রাখালের পায়ের কাছে ধরিয়া দিল। তারপর অপর্ণা নীলিমাকে বলিল, বউদি, তোমার

কি কি আছে এনে দাও। নীলিমা কহিল, লক্ষ্মীটি, ঠাকুরঝি, আমার ঘরের ভিতরেই একটা বোঁচকায় সব বাঁধা আছে। নিয়ে এস না। আমি ততক্ষণ মা'র কপালটা বেঁধে দিই। অপর্ণা তাহাও আনিয়া দিল। রাখাল সেগুলো পাঁজা করিয়া তুলিয়া লইয়া তর্ তর্ করিয়া উপর হইতে নামিয়া গেল।

সরোজিনী রাখালকে শুনাইয়া বলিলেন, যাও—সেইখানে থেক'। আমি মলে, আর তুমি কাছা গলায় দিও না। এ আমি বারণ করে যাচ্ছি। যদি দাও—তোমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে তুমি মর্‌বে। আজ থেকে তুমি আর আমার ছেলে নও।

তারপর সরোজিনী খানিক কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

রাখাল সেই সব জিনিষপত্র বাড়ীর সম্মুখে এক খানায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহা দেখিয়া, সে পাড়ার যত সব ছোট লোকের ছেলে মেয়েরা তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

সেইদিন হইতে রাখাল একরকম নিশ্চিন্ত। আর তাহাকে ভাই, বোন, মা'র জন্য ভাবিতে হইবে না। যাহাদের জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল—তাহা ত ফুরাইল; তবে আর অর্থের কি দরকার? আর ঐশ্বর্য্য ধন আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকিয়া কি ফল? বাস্—এইবার রাখালের কেবল মদ চাই। জ্বালা জুড়াইতে মদ চাই; শোক, দুঃখ ভুলিতে মদ চাই—কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তর জন্যও মদ চাই।

এগার

অনেক কষ্টে সীতানাথবাবু এক জায়গায় সুরুচির বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। ছেলেটি বিলাতফেরত ইঞ্জিনিয়ার। পাঁচ শত টাকার বেতনে এক আপিসে চাকুরী করে। তাহারই সহিত সম্বন্ধ ঠিক হইয়াছে। পাকা কথা পাইলেও সীতানাথবাবু স্থির হইতে পারিতেছেন না। তিনি অমন পাকা কথা পূর্ব্বে অনেক স্থানেই পাইয়াছিলেন; কিন্তু শেষে কোন ফল হয় নাই। এ ক্ষেত্রেও তাই বুঝি হয়—এই আশঙ্কাটা তাঁর বড় বাড়িয়াছে। তাঁহার দিবারাত্র ওই এক চিন্তা—সুরুচির বিবাহটা ভালয় ভালয় সম্পন্ন হইলে হয়।

দেখিতে দেখিতে পাকা দেখা হইয়া গেল। বিবাহের দিনও ধার্য্য হইল। তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন—কোনও রকমে চুপি চুপি কাজ সারিতে। বেশ ঘটা করিয়া সুরুচির বিবাহ দিতে তাঁর আর ইচ্ছা হইল না।

দিন নাই—কাল বাদে পরশু দিন বিবাহ। সীতানাথবাবু পাড়ার সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। কেবল রাখালকে করিলেন না। সে সমাজচ্যুত—তার আহ্বান আর কোন সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মে নাই। তাই রাখাল এক কোণে পড়িয়া রহিল।

সেদিন দুপুর বেলা কেহ কোথাও নাই। কোনও আত্মীয় স্বজন এখনও নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহের পূর্ব্বে সীতানাথবাবুর বাড়ীতে আসে নাই। সুরুচির মা ঘুমাইতেছেন। সুরুচি এই সুযোগটাই আজ ক'দিন ধরিয়া খুঁজিতেছিল।

সীতানাথবাবুর বাড়ী আর রাখালের বাড়ী ঠিক সাম্না সাম্নি। মধ্যে চার হাত চওড়া একটা গলি। সুরুচি আর কাল বিলম্ব না করিয়া রাখালের বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। চাকর, দারোয়ান মেয়ে ছেলে দেখিয়া আর কিছু বলে নাই। রাখাল কোন্ ঘরে থাকে—সুরুচি তাহা জানিত। সে এই দু'মাসেই সমস্ত খবর রাখিয়াছে ও লক্ষ্য করিয়াছে। সিঁড়ি ধরিয়া আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া আসিল। দোতলার বড় ঘরটার দরজা বন্ধ। সে ধীরে ধীরে তাহা ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিল। খুলিতেই দেখে রাখাল তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে। অন্যমনে খোলা জানালার পানে চাহিয়া কি যেন আকাশ পাতাল ভাবিতেছে। খানিকক্ষণ সুরুচি রাখালের পাংশু মুখের পানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রাখালের পাশেই মদের বোতল ও গেলাশ রহিয়াছে। হঠাৎ রাখাল মুখ ফিরাইয়া বোতলে হাত দিল। চোখ ঘুরিতেই সুরুচিকে দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিল। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে; মুখে কথা নাই; হাতের বোতল হাতেই রহিয়াছে—যেন অপরাধী সন্তান ক্ষমা আশে মায়ের পানে চাহিয়া আছে। আর বেশীক্ষণ সুরুচির পানে তাকাইয়া

থাকিতে পারিল না। চোখের পাত যেন আপনা আপনি নত হইয়া পড়িল। সকল কথা—সকল ঘটনা—তাহার মানস পটে একে একে জাগিতেছে। সেই নিষ্ঠুর রাত্রে সুরুচিকে দেখিয়াছে—আর এই আজ দিন দুপুরে ভরা আলোয় সুরুচিকে দেখিতেছে। সেদিন সে কেমন করিয়া তার আদরের মাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করিয়া আসিয়াছিল; কেমন করিয়া তাহাকে এতদিন লোকসমাজে একরকম কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছে—এসকল কথা তাহার মনে উদয় হওয়াতে—সে আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিল না। সুরুচি আজ কেন আসিয়াছে? এইত সেদিন সে সীতানাথবাবুকে নানা কথা শুনাইয়া দিয়াছে। ঘরে বসিয়া মাতাল হইয়া সে ত রোজ তাঁহাকে গালাগাল দেয়। তাঁরির মেয়ে—অবিবাহিতা যুবতী সুন্দরী—তাহার ঘরে আবার কি করিতে প্রবেশ করিয়াছে? এমন অবস্থায় যদি কেহ দেখিয়া ফেলে—তাহা হইলে কি হইবে? সেত মাতাল—লম্পট—চরিত্রহীন—তাহাকে আর নূতন করিয়া কি বলিবে! কিন্তু সুরুচির কথা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। আর চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিল না! সুরুচি তাহার হাতের বোতলটা চোখের দৃষ্টির আঘাতে যেন ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। রাখাল জোর করিয়া সুরুচির পানে নতমুখ তুলিয়া ধরিল। তাড়াতাড়ি বেশ হাসিমুখেই জিজ্ঞাসা করিল, মা, এখানে কি করতে এসেছ? কোন দিন ত আস নি? আজ এমন দয়া তোমার কেন হ'ল?

সুরুচি গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিল—এসেছি তোমর পায়ে ধর্‌তে।

রাখাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমার পায়ে ধর্‌তে ?

—হাঁ।

—কেন ?

—মাপ চাইতে।

—তুমি ত কিছু দোষ কর নি, মা। আমি তোমায় কি মাপ কর্‌ব !

—এই দুটো দিন তোমায় আমার জন্যে—

সুরুচি আর বলিতে পারে না। মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখাল বলিল, কি বল, মা ? এই দুটো দিন আমি তোমার জন্যে কি কর্‌ব ?

—আমার বাবাকে গালাগাল দেওয়াটা বন্ধ রাখ্‌বে। পরশু আমার বিয়ে। এসময় যদি তুমি গোলমাল কর—তাহ'লে এ সম্বন্ধ ভেঙে যাবে। বাবা তাহ'লে আমার জন্যে পাগল হয়ে পড়্‌বে। পার্‌বে কি না বল ? নইলে আমি আমার অন্য পথ দেখ্‌ব। আর বাপ মাকে কষ্ট দিতে চাই না।

রাখাল 'হুঁ' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মদের বোতলটা আর গেলাসটা পা দিয়া এক কোণে সরাইয়া রাখিল। আবার সেই

খানেই বসিয়া একটু পরেই বলিল, আচ্ছা, গালাগাল আমি দোব না। তবে আমি মদ খাব।

সুরুচি কহিল—তা খেও; আমি তোমায় নিষেধ কর্‌তে আসিনি। তোমায় প্রথম প্রথম নিষেধ কর্‌তে যাওয়া আমার বড় অন্যায় হয়েছিল, এখন তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

রাখাল ডাকিল—মা—

সুরুচি বাধা দিয়া বলিল,—আমায় আর ও নাম ধরে ডেক' না, তোমার পায়ে পড়ি।

রাখাল বলিল—কেন? মাতালের কি 'মা'বল্‌বার অধিকারটুকুও নেই?

সুরুচি কহিল—না। আমি চল্‌লুম। এই কথাটাই বল্‌তে এসেছিলুম।

রাখাল কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, আমার কাছে তোমার কেমন করে সাহস হ'ল আস্‌তে?

সুরুচি উত্তর দিল—আর দাঁড়িয়ে বেশী কথা কইতে চাই না। আমি লুকিয়ে এসেছি—সকলে ঘুমোচ্ছে দেখে।

রাখাল সুরুচিকে আর কিছু বলিতে দিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া উন্মুক্ত দরজার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল, লুকিয়ে এসেছ? যাও—যাও—এক্ষুণি যাও। আমার বাড়ী থেকে যাও তুমি। মাতালের কাছ থেকে পালাও তুমি। এক্ষুণি [illegible] পড়ে

যাবে। আমার বন্ধুবান্ধবেরা—সমাজের মাতব্বররা—সব বোধ হয় এতক্ষণে টের পেয়ে গেল। সর্ব্বনাশ হবে—সর্ব্বনাশ হবে। তোমার বুকে চিরকাল মহা দাবানল জ্বলবে, যদি এ বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায়। তা ছাড়া এ খান্‌কীর বাড়ী—বেশ্যার আলয়—আর আমি তাদের কৃপাভিখারী। তারা হাজার ভদ্র, সভ্য হলেও, তোমার মত মায়ের সেখানে আসা শোভা পায় না। যাও—তুমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাও। মনে কোরো—তোমার ছেলে—না—না—রাখাল রাখাল—তোমায় দূর্ দূর্ করে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর কক্ষণো এবাড়ীতে ঢুক না।

কথাটা এক দমে বলিতে বলিতে তাহার বুকে কি একটা ব্যথা জাগিয়া উঠিল। সে তা সত্ত্বেও সুরুচিকে বরাবর উপর হইতে নীচের দরজা পর্য্যন্ত যেন তাড়াইয়াই লইয়া আসিল। সুরুচি দৌড়িয়া বাড়ী চলিয়া গেল। কেহ দেখিতে পাইল না। তাহার পিছনেই রাখাল নিজের দরোয়ানকে বলিল, 'ইস্‌কো কভি মত্ ঢুক্‌নে দেও'। খোঁট্টা দরোয়ান 'বহুত আচ্ছা' বলিয়া—মনিবের হুকুম শুনিয়া রাখিল. কথা ক'টা সুরুচি শুনিতে পাইয়াই চলিতে চলিতেই পিছন ফিরিয়া দেখিল, রাখাল সজল চক্ষে এক দৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। সে আর কিছু বলিল না। একেবারে নিজেদের বাড়ী ঢুকিয়া, এদিক্ ওদিক্ একবার ঘুরিয়া বেশ বুঝিল, কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে

নাই। তাহার মাতৃহৃদয়ের চাঞ্চল্য কেহ কিছু লক্ষ্য করে নাই।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সুরুচির বিবাহ হইয়া গেল। রাখাল তাহার কথাটা রাখিয়াছে। এ ক'দিন আর কোন গোলমাল করে নাই। একেবারে মদ খাইবে না মনে করিয়াছিল; কিন্তু ততটা পারে নাই। মাঝে মাঝে তাহাকে পান করিতে হইয়াছিল। নহিলে তাহার মন যেন শান্ত থাকে না; কি যেন নানা উৎকণ্ঠা, নানা চিন্তা তাহার ঘাড়ে চাপিয়া ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করে।

বিবাহের পরদিন বর ক'নে যখন বিদায় হইবে, রাখাল একখানা চাদর গায়ে দিয়া নিজের বাড়ীর সম্মুখে চলাফেরা করিতে লাগিল। তাহার পাশ দিয়াই সুরুচি নব পরিণীত স্বামীর সহিত শ্বশুরবাড়ী চলিল। রাখালের দিকে একবার চাহিতে ভুলিল না। রাখালও তার মুখের পানে চাহিয়াছিল। তারপর যতক্ষণ দেখা যায় রাখাল সুরুচিকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল—যেন ইহজীবনে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। সুরুচি চলিয়া গেলে, রাখাল আর বেশীক্ষণ বাহিরে রহিল না। খানিক পরেই সে তার নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কেহ আর সেদিন তাহাকে ঘরের বাহির হইতে দেখে নাই।

বারো

সুরেন উষাকে গান শিখাইতে আসে। আধুনিক বাঙ্লা গানের নূতন ঢঙ্ সে বেশ আয়ত্ত করিয়াছে। উষার সে সব বেশ ভাল লাগিত। গানের সুর গলায় তুলিয়া দিয়াই সুরেন নিশ্চিন্ত থাকিত না। কোন্ সুর ভাঙিয়া কোন্ সুর গঠিত হইয়াছে; কোন্ রাগ ও রাগিণীর একত্র মিলনে কোন্ ঝঙ্কার সুরের মাঝে ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে; ভারতীয় সঙ্গীত বলিতে কি বুঝায় আর পাশ্চাত্য সঙ্গীত জনপ্রিয় কি না—এসব লইয়া উষার সহিত একটু আলোচনাও করিত। সঙ্গীত বিদ্যায় জ্ঞান তাহার প্রচুর না থাকিলেও সে দেখাইত, নিজে একজন ওস্তাদ; গুণী লোক ছাড়া সে কাহারও কাছে গুণ প্রকাশ করে না। নেহাৎ উষাকে ভালবাসে বলিয়াই সে উষার জন্য এত পরিশ্রম করিতেছে। উষাও তাহা মন দিয়া শুনিত।

রাখালের সহিত উষার বিবাহ হইবার পূর্ব্বে সুরেন উষাকে চিনিত না। আলাপ পরিচয় হইল তাহার পরে।

একদিন শ্রাবণ সন্ধ্যায় বালিগঞ্জের লেকের ধারে বসিয়া সুরেন আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়াছে। পাশে তাহার কেহই ছিল না। উষা নিত্য লেকে বেড়াইতে আসিত। সে তাহার

গানের তানে মুগ্ধ হইয়া সুরেনের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুরেন সেটা লক্ষ্য করিলেও বিশেষ ভদ্রতা দেখাইয়া গানের ভাব নষ্ট করে নাই। গানখানা সমস্ত গাহিয়া সে যেন আপনভোলা হইয়া একদৃষ্টে লেকের উপর চাহিয়া রহিল।

গুণী গুণীর গুণ বোঝে; তাই ঊষা একটু কাছে আসিয়া সুরেনকে একটা নমস্কার ঠুকিয়া বলিল, আপনার গলাটি ত বেশ। সুরেনও তাই আশা করিতেছিল। তারপর অনেক কথাবার্ত্তার পর ঊষা বুঝিল, সুরেন আসানসোলে থাকে। তার বাপ ওখানকার খুব বড় ডাক্তার। ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সুরেন কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিয়াছে। ভবানীপুরে তাহার কাকার বাড়ী। সেইখানে থাকিয়াই পড়াশুনা করে।

ঊষা তাহাকে নিজের সত্য পরিচয়টা আর দিল না। সুরেনেরও আর তাহা জানিবার প্রয়োজন হইল না; তবে শুনিয়া সুখী হইল, ঊষাও লেখাপড়া করে, স্কুলে যায়।

তারপর ঊষার অনুরোধে সুরেন রাজী হইল, সে তাহাকে যতটুকু গান জানে তাহা শিখাইয়া দিবে। উপরন্তু এস্রাজ বাজাইতেও শিখাইবে। তাহার মতে যে গানে তারের যন্ত্র না বাজে—সে গানের মাধুর্য্য নাই।

শ্রাবণ সন্ধ্যায় প্রথম পরিচয়েই তাহাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া

গেল। সেই রাত্রেই লেক হইতে ফিরিবার সময় উষা সুরেনকে তাহাদের বাড়ী দেখাইয়া দিল।

সেই অবধি সুরেন উষাকে গান শিখাইয়া আসিতেছে। প্রথম সপ্তাহে দুই দিন আসিল। কিন্তু বিষয়টা যেহেতু গুরু, সেটাকে আয়ত্ত করিতে হইলে অনেকটা সময় তাহার জন্য ঢালিতে হইবে, তাই দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে সুরেন রোজই আসিতে লাগিল।

সুরেন মাইনে-করা মাষ্টার নয়। সে মাহিনা চাহে না। উষার ভালবাসার নেশায় তার মনে বেশ রঙ্ ধরিয়াছে। এ ক্ষেত্রে পকেট হইতে কিছু দিয়াও যদি তাহাকে. গান শিখাইতে আসিতে হয়, তা' হইলেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না। এমনি ·তাহার উদারতা—এমনি সে বিদ্যাদানে মুক্তহস্ত।

রাখাল এ সমস্তই লক্ষ্য করিল। মাতাল হইলেও বুঝিতে পারিল, বালিগঞ্জের বাসা না ভাঙ্গিয়া দিলে এ সব উপদ্রব থামিবে না। কথাটা শুনিয়া উষা মাথা নাড়িল। তাহার এ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা নাই। লেকের হাওয়া রোজ না খাইলে তাহার স্বাস্থ্য সুস্থ থাকিবে না। সে বুঝিয়াছিল, বেশীদূরে গিয়া পড়িলে হয়ত সুরেন গান শিখাইতে যাইতে পারিবে না। এটা জানিত না যে, তাহাকে শিখাইতে—তাহার কণ্ঠে কোকিলের স্বর ফুটাইতে সুরেনকে যদি দুইবেলা এই বিরাট সহরের এক প্রান্ত

হইতে অন্য প্রান্তে ছুটাছুটি করিতে হয়—তাহাতেও সে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিবে না। এমনি তাহার মনের অবস্থা।

সুরেনের কাকা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। ডাক না থাকিলেও নাম ছিল। সুরেন পড়াশুনা করিতেছে কি না—এ সব খবর লইবার জন্য তাঁহার যথার্থ ই সময়ের অভাব।

সুরেন কলেজের ছাত্র আর উষা স্কুলের ছাত্রী। স্কুল কলেজের মাষ্টার অধ্যাপকেরা উভয়ের আকার চোখে দেখিতে পাইলেও তাহাদের পরস্পরের মন সারাদিন পরস্পরের পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। উভয়ে কেবলি ঘড়ি দেখে—বিকাল হইলে হয়। লেকের হাওয়া না পাইলে তাহাদের যেন দম বন্ধ হইয়া আসিত।

রাখাল ইচ্ছা করিয়াই বাড়ীওয়ালার সহিত এক মাসের ভাড়া লইয়া গোলমাল করিয়া বসিল। তাহাতে বাড়ীর মালিক নোটিশ দিলেন। রাখালও উঠিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিল।

সীতানাথবাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াও রাখাল এ উপদ্রব থামাইতে পারিল না। সুরেন যেমন আসিত—তেমনি আসিতে লাগিল।

উষা একদিন সুরেনকে বলিল, দেখ, আমি একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি।

সুরেন জিজ্ঞাসা করিল, কি ?

উষা কহিল, ওই মাতাল লোকটাকে আমার husband করে-

সুরেন স্পষ্টই বলিল, কেন তুমি ওকে বিয়ে করলে?

ঊষা কহিল, কেবল মা'র জন্যে। আমার কিন্তু মোটেই ইচ্ছা ছিল না। শিক্ষিত, শিক্ষিত করে মা আমায় বিরক্ত করে মেরেছিল। আচ্ছা, ওকে কি কোনওরকমে তাড়ান যায় না?

সুরেন কহিল, তাড়িয়ে লাভ কি? ওর সঙ্গেই সংসার কর না।

ঊষা বলিল, না, আমি তা পারব না। এক একদিন ইচ্ছে করে কি জান? ওকে এমন মদ খাইয়ে দিই যে আর যেন চোখ না চায়।

সুরেন জিজ্ঞাসা করিল, তা পার না কি?

ঊষা হাসিয়া ফেলিল। এমনি করিয়াই ইহাদের দিন কাটে। ঊষার মা কিন্তু তাহাতে কিছু বলিত না।

সীতানাথবাবুর সহিত যেদিন সকালে রাখালের বচসা হয় তাহার সপ্তাহ খানেক পরে ঊষা একদিন রাখালকে কি বলিতে আসিয়াছিল। সে তাহার মায়ের সঞ্চিত অর্থ সমস্তই উড়াইয়া দিতেছে; নিজের ত জীবন নষ্ট হইয়া গেছেই—তাহাদেরও জীবন যে তাহার সহিত নষ্ট হইয়া যাইতেছে, ইহার উপায় কি হইবে?

রাখাল খানিকক্ষণ কথাগুলো শুনিয়া গেল। ঊষা বেশ ধীরে ধীরেই কথাগুলো বলিতেছিল; যেন রাখালের জন্য তাহার কত চিন্তা দিবারাত্র জাগিয়া আছে।

রাখাল সমস্ত শুনিয়া বলিল, দেখ, এটা বুঝতে পারনি?

আমার জীবন বহু পূর্ব্বেই নষ্ট হয়েছে বলেই ত নষ্টদের কাছে এসেছি। লেখাপড়া শিখ্‌ছ আর এটা বুঝ্‌তে পার্‌লে না? ঊষা, তুমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ ক'রনা আমার জন্যে। তোমার যা প্রাণ চায় তুমি কর্‌বে আর আমার যা প্রাণ চায় আমি কর্‌ব। এতে কেউ কারোয় বাধা দিও না।

ঊষা কহিল, এই যদি তোমার মনের ইচ্ছে, আমার বিয়ে কর্‌লে কেন?

রাখাল বলিল, তোমায় বিয়ে করেছি তোমার মাকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত কর্‌তে নয়। আমার অভাব ছিল। নেশার পয়সা জোটাতে পার্‌তুম্‌ না বলেই এই কাজ করেছি।

ঊষা বলিল, তুমি আমার মাকে তাহলে ঠকিয়েছ?

রাখাল তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, নিশ্চয়ই। তোমার মাকে ঠকিয়েছি, তা'বলে তোমায় ঠকাইনি, ঊষা।

ঊষা জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম?

রাখাল কহিল, আমি যদি আজ এই সব ছেড়ে দিয়ে—

ঊষা বাধা দিয়া বলিল, কি ছেড়ে?

রাখাল কহিল, এই মদ খাওয়া ছেড়ে; দিনরাত কবির মত আন্‌মনে ভাবা ছেড়ে—তোমার মা যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি যদি হই; তা'হলে তোমার ওই সুরেনের কাছে গান শেখাটা যে আগে বন্ধ হয়ে যাবে। ঠুংড়ির চাল, গজলের ঢঙ্‌ এ সব যে আর

তোমার কণ্ঠ থেকে বেরুবে না, উষা। দেখ, বিরক্ত ক'রনা আমায়। আমি তোমায় কিছু বল্‌তে চাই না। তবে সুরেনকে জিজ্ঞেস কোরো। তার যদি সাহস থাকে—সে যেন তোমায় বিয়ে করে। তোমার মা তালে সুখী হবে। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।

উষা স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল, আমার মা, যে টাকা, বাড়ী তোমার নামে লিখে দিয়েছে, তার কি হবে?

রাখাল বলিল, এক পয়সা ফেরত পাবে না। আমি সব এবার যা আছে খরচ করে যাব।

উষা রাগিয়া গেল। বুঝিল, মিষ্ট কথায় কাজ হইবে না। রাখাল মাতাল হইলেও রাখালের জ্ঞান আছে।

উষা একটু সুর চড়াইয়াই বলিল, তোমাকে স্বামী বলে মান্‌তে আমার নিজেরি লজ্জা করে।

রাখালও হাসিয়া উত্তর দিল, আর তোমায় আমার পরিবার বলে ভাব্‌তে বড়ই গৌরব বোধ করি। তারপর বিরক্ত হইয়া বলিল, যাও।

উষা আর থাকিতে পারিল না। রাগের মাথায় বলিয়া বসিল, বুঝিছি—সেদিনের সকালের ঘটনা থেকে, তুমি ওই মেয়েটার জন্যে—

রাখাল তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিল, দেখ উষা, আমি এ

জীবনে সবই করে এসেছি। কেবল মানুষ খুন করাটা বাকি আছে। তুমি কি সেইটে আজ আমাকে দিয়ে করাতে চাও?

রাখালের মুখের ভাব দেখিয়া ঊষার কেমন ভয় হইল। বুঝিল এ আর সেই শ্রাবণ সন্ধ্যায় লেকের ধারে বসিয়া প্রেমালাপ করা নহে। তাই সে আস্তে আস্তে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

ঊষার মা বুঝিয়াছিল, রাখালকে রাগাইলে কোন কাজ হইবে না; এখন তাহার হাতেই সব। ঊষাকে বিবাহ করিতে গিয়া রাখাল এক মাস তাহাদের বাড়ীতে ছিল। এম, এ পাশ শুনিয়া ঊষার মা আর দেরী করে নাই। জীবনে যে লোক চড়াইয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, সে কথা কহিলেই বুঝিতে পারে লোকের শিক্ষা কতদূর। ঊষার মাও তাই রাখালকে পাইয়া বুঝিয়াছিল, সে শিক্ষিত। বিবাহের পূর্ব্বেই সে রাখালের নামে টাকা ও বাড়ী প্রতিশ্রুতি মত লিখিয়া দিল।

ঊষা দুঃখ করিলে তাহার মা বলে, ওরে, মদ খায় খাক্; একা আর কত খাবে? কিন্তু সাবধান—মোটা টাকা ধাঁ ক'রে কিছুতে যেন না খরচ করে বসে

ঊষা সেইদিন হইতে আর রাখালকে কোন কথা বলিতে আসে নাই। বেশ চুপ করিয়াই তাহার কার্য্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

এখন রাখাল যা বলে ঊষার মাকে তাই শুনিতে হয়।

রাখাল বাসা আবার বদলাইতে চায়। এখানে তাহার আর মন টেঁকিতেছে না। ঊষার মাও শুনিয়া বলিল, যা ভাল বোঝ, বাবা, করো।

গোপনে নিত্য পরামর্শ চলে, রাখালের কাছ হইতে কেমন করিয়া সব ফিরাইয়া লইবে। সুরেনও সে পরামর্শে যোগ দেয়। কিন্তু সহজে কেহই কোন পথ বাহির করিতে পারে না।

সুরেন ছাড়া ঊষার মতলব লইবার লোক আরও অনেক আছে। তাহারাও আসে যায়। হাসিয়া গল্প করিয়া ঊষা কথায় কথায় তাহাদেরও কাছে রাখালের নিন্দা করে।

রাখালের বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই সংসারী, সকলেই উপার্জ্জনক্ষম। রাখালের মত ছন্নছাড়া নিষ্কর্ম্ম উচ্ছৃঙ্খল জীবন কেহই যাপন করে না। রাখালের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কাহারও ইচ্ছা রহিল না। রাখাল ইচ্ছা করিয়াই নিজের জীবন এমন ঘৃণ্য করিয়াছে। তাহারা কি করিবে? যখন দেখিল, সীতানাথবাবুর মেয়ের বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল, তখন সকলে একটু অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। রাখালের সম্বন্ধে আর এক পশলা জোর আলোচনা নামিল। কি ভাবিয়া একদিন সুধীর একাই রাখালের সহিত দেখা করিতে গেল। উপরে আর উঠিতে হইল না; নীচেই দরোয়ান জানাইয়া দিল, বাবু কৈ আদ্‌মিকো সাথ্ মুলাকাৎ নেই কর্‌তা। তাহার ইচ্ছা করিল, দরোয়ানের কাছ হইতে রাখালের

বর্ত্তমান অবস্থাটা জানিয়া যায়। কিন্তু দু'একটা প্রশ্ন করিতেই বুঝিতে পারিল, দরোয়ান কিছু জানে না অথবা জানিলেও বলিবে না।

উপর উপর তিন বৎসর বর্দ্ধমান কলেজ হইতে আই, এ পাশ করিতে পারিল না বলিয়া, সুরেনের বাপ সুরেনকে কলিকাতায় পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন। পরীক্ষার পূর্ব্বে কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুরেনের বাপ সুরেনকে আসানসোলে চলিয়া আসিতে লিখিলেন। প্রত্যুত্তরে সুরেন লিখিয়া জানাইল যে, আসানসোলে গিয়া থাকিলে তাহার পড়াশুনা ভাল হইবে না। এখানে দরকার হইলে প্রায়ই অধ্যাপকদিগের কাছে যাইতে পারিবে। ওখানে গিয়া থাকিলে আর সেটি হইবে না।

সুরেনের বাপ দিন কতক চুপ করিয়া রহিলেন। পরে যখন জানিলেন ছোট ভা'য়ের পত্র পড়িয়া যে, সুরেনের পড়ায় মন নাই। কখন যে সে বই লইয়া বসে তাহার ঠিকও নাই। রাত্রি দশটার পূর্ব্বে ত বাড়ীর লোক তাহার ভাল করিয়া মুখ দেখিতে পায় না। এমনি সে বাহিরের কাজে ব্যস্ত। ইত্যাদি আরও অনেক কথা পত্রে লেখা ছিল।

সুরেনের বাপ আর ভাল বুঝিলেন না। দু'দিন আসিয়া যে তিনি ভবানীপুরে থাকিয়া ছেলের পড়া কেমন হইতেছে দেখিয়া যাইবেন, তাহাও পারিলেন না। প্রথমে পত্রে ছোট ভাইকে সুরেন

কোথায় যায়, কি করে এসম্বন্ধে গোপনে একটু খোঁজ নিতে লিখিয়া একদিন বৈকালে তিনি সশরীরে ভবানীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোট ভাই ইহা জানিতেন—জানিত না সুরেন।

সুরেনের বাপের উপর সুরেন কথা কহিতে পারিত না। তিনি একটু রাশ-ভারী লোক ছিলেন। সুরেনের ছোট কাকা খুব রসিক। তিনি ভাইপোকে কিছু বকিতেন না—ঝকিতেন না। সুরেনও তাঁহাকে বড় একটা ভয় করিত না, কিন্তু মানিত খুব—তাহার সে গুণটা ছিল।

সুরেনের বাপ মটরে করিয়া একেবারে সন্ধ্যার পর রাখালের বাড়ী আসিয়া হাজির। বাড়ীর একজন পুরান চাকর খুব চালাক চতুর ছিল। ছেলেবেলায় সুরেনকে সে অনেকবার কোলে করিয়া এদিক ওদিক বেড়াইয়া আনিত। সে ড্রাইভারের পাশে বসিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল।

রাস্তার ধারে মটর আসিয়া থামিল। সুরেনের বাপ আর নামিলেন না। সুরেনকে ডাকিয়া আনিতে চাকরকে পাঠাইয়া দিলেন।

চাকর বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল, সুরেন বাবু—সুরেন বাবু।

সুরেন তখন উপরে বসিয়া উষাকে এস্রাজ শিখাইতেছিল।

ঊষার ডান হাতে এস্রাজের ছড়ি চলিতেছিল আর বাঁ হাতের চম্পক অঙ্গুলি এস্রাজের গাঁটে গাঁটে ছুটাছুটি করিতেছিল। সুরেনের হৃদয়তন্ত্রীতেও যে সে ছড়ির টান না বাজিতেছিল—তাহা নহে।

হঠাৎ চাকরের চীৎকারে সুরেনের মধুর স্বপন যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

চাকর বলিল, আমি পঞ্চু।

কবে যে পঞ্চু সুরেনের পাছু পাছু আসিয়া রাখালের বাড়ী দেখিয়া গিয়াছে—এ খবর সুরেন জানিত না। সে তাই আকাশ হইতে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, পঞ্চু—কেন রে?

পঞ্চু কহিল, একবার নীচে আসুন।

কথা শুনিয়া সুরেনের মুখখানা ম্লান হইয়া উঠিল। সে ঊষাকে বলিল, আমি আজ যাচ্ছি। চাকর ডাক্‌তে এসেছে।

ঊষা জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সুরেন বলিল, কি জানি বুঝ্‌তে ত পারছি না।

ঊষা এস্রাজ রাখিয়া বলিল, কি রকম, কোন দিন ত তোমায় কেউ ডাক্‌তে আসে না।

সুরেন এ কথার আর কোন উত্তর না দিয়া নীচে নামিয়া আসিলে, পঞ্চু বলিল, বড়বাবু এসেছেন, আপনাকে ডাক্‌ছেন, চলুন।

কথা শুনিয়াই সুরেন চমকিয়া উঠিল ; বলিল, কে—বাবা এসেছেন ?

পঙ্কু উত্তর দিল, হাঁ।

সুরেন প্রশ্ন করিল, কোথায়—ভবানীপুরে আছেন ?

পঙ্কু বলিল, না, ওই রাস্তার ধারে মটরে বসে আছেন।

মটরে বসে আছেন !—সুরেনের মুখে আর কথা নাই ; মনে মনে বলিল, মা বসুধে, দ্বিধা হও।

পিছন ফিরিয়া একবার তাকাইয়া দেখিল, ঊষা নীচে আসে নাই ; আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। পঙ্কুর সঙ্গে সঙ্গে একরকম কাঁপিতে কাঁপিতেই বাপের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সুরেনের বাপ সকল বুঝিতে পারিয়াছেন। পঙ্কু সমস্ত খবর যোগাড় করিয়া আনিয়া সুরেনের ছোটকাকাকে জানাইয়াছিল। তাঁহার নিকট হইতে সুরেনের বাপ শুনিয়াছিলেন।

সুরেন কাছে আসিতেই, সুরেনের বাপ অন্য কোন কথা না তুলিয়াই সুরেনকে বলিল, এস, গাড়ীতে ওঠ। তাঁহার কথাতে কিছুমাত্র রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্য্য কথাটির ভিতর থাকিয়া সুরেনের বুকে কেবল গম্ গম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

সুরেন গাড়ীতে উঠিয়া বাপের পাশে বসিতেই, মটর ছাড়িয়া দিল ; থামিল একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া। সুরেনের কাকা

সেখানে সুরেনের জিনিষ পত্র, বই, খাতা সব একটা বড় সুটকেশে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এ মতলবটা—তাঁহারি মাথায় খেলিয়াছিল। নহিলে সুরেনকে এমন ভাবে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন না।

এতক্ষণে সুরেন বুঝিতে পারিল, তাহাকে বাপের সহিত আসানসোলে যাইতে হইবে। কাল যাইব—বলিলেও চলিবে না। কি আর করিবে, বাপের পাশে মাথা নত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আর তাহার অন্তরে সেই শ্রাবণ সন্ধ্যার স্মৃতিটি কেবল ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

সাহেবী হোটেলে তিনজনে আহার সারিয়া লইলেন। সুরেনের বাপ ও কাকা সংসার সম্বন্ধে নানান কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তারপর একখানা এক্সপ্রেস ট্রেণের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া সকলে বসিয়া পড়িল। একটু পরেই গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল: সুরেনের কাকা তখন কাম্‌রা হইতে নামিয়া, বাহির হইতে সুরেনকে বেশ মিষ্ট কথায় ধীরে ধীরে বলিলেন, ভয় কি বাবা, এবার পাশটা কর। আমি তোমার বিয়ের ঘট্‌কালি এই রাত থেকেই সুরু কর্‌ছি। সুরেন লজ্জায় অধোবদনে রহিল। সুরেনের বাপ আর সে কথাগুলো শুনিতে পাইলেও যেন শুনিতে পান নাই এমনি ভাব দেখাইলেন।

তেরো

কিছুদিন পরে খবরটা পাড়ায় হঠাৎ রটিয়া গেল যে, রাখাল শীঘ্রই এবাড়ী ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। ভিতর ভিতর বাড়ীর সন্ধানও হইতেছে। খবরটা শুনিয়া সীতানাথবাবু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহাকে ত মাঝে মাঝে পিত্রালয়ে আনিতে হইবে। আবার যদি রাখাল এখানে থাকিতে থাকিতে কিছু কাণ্ড করিয়া বসে—তখন কি করিবেন ; এই চিন্তাই তিনি করিতেছিলেন। ভিতর ভিতর চেষ্টাও হইয়াছিল—ভদ্রপল্লী হইতে অভদ্র সংসার তুলিয়া দিতে। যেমন করিতে হয়—পাড়ার পাঁচজনের সহি লইয়া উচ্চতম পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট সীতানাথবাবু একখানি আবেদন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই রাখালের উপর নোটিশ আসিবে—এই আশায় তিনি আশান্বিত ছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রাখাল যখন স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইবে শুনিলেন, তখন তাঁহার নিরানন্দ হইবার কোনও কারণ ছিল না।

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। রাখাল আর বাড়ীতে মায়ের কাছে যায় নাই। কি করিয়াই বা যাইবে, তাহার যাইবার পথ নাই। মনে মনে যদিও জানিত—মায়ের কাছে যাইলে মা তাহাকে তাড়াইয়া দিবে না ; যা করিয়াছে তাহার জন্য ক্ষমা চাহিলে নিশ্চয়ই

ক্ষমা করিবে ; কিন্তু তথাপি যাইতে পারিত না। তার মজ্জাগত অভিমানই তাকে বাধা দিয়া রাখিত।

নানান শোকে তাপে সরোজিনীর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িল। আপন মনে তিনি দিন রাত কেবলি বসিয়া কাঁদেন। কারোর সান্ত্বনায় আর তিনি আশ্বস্ত হন্ না। রাখালের আঘাতে যেন তাঁর জীবনের সুখ শান্তি সকলি ঘুচিয়া গিয়াছে। অপর্ণার বিবাহের জন্য আর তিনি গোপালকে কিছু বলেন না। যার যা ইচ্ছা যায় করিবে, এই রকম ভাব দেখান।

আজ দশদিন সরোজিনী একজ্বরী হইয়া পড়িয়া আছেন। মুখে কিছুই দিতে চান্ না। গোপাল ডাক্তার ডাকিয়া আনিল ; ডাক্তারের ব্যবস্থা তিনি কিছুই মানিয়া চলিলেন না। অবস্থা দিন দিন মন্দের পথে দৌড়াইতে লাগিল। অপর্ণা ও নীলিমা সারাদিন সরোজিনীর কাছে বসিয়া থাকে, কিন্তু তিনি তাহাদের সহিত ভাল করিয়া কথা কন্ না।

নীলিমা মনে মনে ভাবিল, রাখালকে দেখিতে পাইলে হয়ত সরোজিনী প্রাণে আনন্দ পাইবেন ; নেপালকে তাই একদিন রাখালের কাছে মায়ের অবস্থা খুলিয়া জানাইতে পাঠাইয়া দিল। গোপাল তাহা জানিত না।

নেপাল রাখালের বাড়ী চিনিত। সে পূর্ব্বে রাখালের সহিত দু' একবার দেখা করিয়া আসিয়াছে। গোপাল আপিসে চলিয়া

গেলে একদিন দুপুর বেলায় নেপাল রাখালের বাড়ী আসিয়া রাখালকে বলিল, মেজদা, মায়ের অবস্থা বড় খারাপ। একবার দেখ্‌তে যাবে না?

রাখাল সকল কথা শুনিয়া উত্তর দিল, না ভাই, তোমরা মাকে দেখ। তোমাদের কর্ত্তব্যকাজে আমি আর বাধা দিতে ইচ্ছা করি না।

নেপাল অনুরোধ করিল, তোমার পায়ে পড়ি, মেজদা, একবার খানি চল। তোমায় চোখে দেখ্‌তে পেলে মা আবার মনে বল পাবে।

রাখাল কহিল, দূর পাগল, ভুল। আমায় দেখ্‌লে, যে ক'দিন বাঁচ্‌ত, তাও বাঁচবে না। ধড়্‌ফড়্‌ করে মরে যাবে।

রাখালের নিজের ঘরে দুভায়ে কথা হইতেছে। আর কেহ সে ঘরে নাই। পাছে কেহ ঢুকিয়া পড়ে—এই জন্য রাখাল নিজে উঠিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া বসিল।

নেপাল আবার বলিল, দুপুর বেলা' একদিন চল না, মেজদা। বড়দা তো আপিসে যাবে, বাড়ী থাকবে না তখন আর তোমার আপত্তি কিসের?

রাখাল খানিকক্ষণ বসিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। তার-পর মুখ নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমায় দেখ্‌বার জন্যে মা কি তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে?

নেপাল সত্য কথা বলিল, মা আমায় পাঠায়নি। এখানে মাঝে মাঝে আসি যাই—তা বাড়ীর কেউ জানে না, এক বৌদি ছাড়া। মার মুখ দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারি—মার কি হচ্ছে ?

বিশীর্ণ মুখে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া রাখাল কহিল, তবে ত তুই মহাপণ্ডিত হয়ে গেচিস্‌। মুখ দেখেই মায়ের অন্তর বুঝ্‌তে পারছিস যখন, তখন আর ভাব্‌না কি।

আরও অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। রাখাল কিছুতেই মাকে দেখিতে যাইতে রাজী হইল না। সরোজিনীর কথা মনে আসিতেই—তার চোখ সজল হইয়া ওঠে; কিন্তু ছোট ভায়ের কাছে সে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিল না।

নেপাল আর বেশীক্ষণ বসিতে পারিল না। তাহাকে আবার এই দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতে হইবে। বাড়ীতে কেহ নাই—সে চিন্তাও তাহার ছিল। সে চলিয়া অসিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। রাখালও উঠিল। রাখালের মুখের পানে তাকাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে তুমি যাবে না, মেজদা ?

রাখাল উত্তর দিল, না ভাই।

নেপাল কহিল, মাকে একবার শেষ দেখাটা চোখেও দেখবে না ?

রাখাল কপালে হাত ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, আমার কপাল, ভাই, আমার কপাল। তুই যা। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখিস্‌! আমার কথা—না—না—তুই আজ যা, নেপাল।

নেপাল ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। রাখাল কি ভাবিয়া ঘরের ভিতর হইতে ডাকিল, নেপাল, নেপাল।

নেপাল মনে মনে করিল, হয়ত রাখালের যাইবার মন হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে যাবে, মেজদা? চল—চল। এখন গেলে, বড়দা বাড়ী ফেরবার আগেই তুমি মার সঙ্গে দেখা করে চলে আসতে পার্‌বে।

রাখাল নেপালের কথায় কাণ দিল না। ঘরের কোণে বিছানার উপর একটা কাঠের বাক্স ছিল—রাখাল তাহা খুলিয়া দশ টাকার দশ কেতা নোট বাহির করিয়া আনিল। নেপালের হাতে নোটগুলি দিতে দিতে বলিল,—দেখ্ নেপাল, এই টাকাগুলো তোর কাছে রাখ্। মার চিকিৎসার জন্য যদি কোন বড় ডাক্তার ডাকৃতে হয়—তুই এই টাকা থেকে তার ব্যবস্থা করিস্। আরো দরকার হয় ত আমার কাছে আস্‌বি—বুঝ্‌লি। কারোয় কিছু জানাস্‌নি।

নেপাল নোটগুলো হাতে করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু রাখালের ছ'চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

রাখাল ঘরের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, নেপাল গলি পার হইয়া চলিয়া যাইতেছে। যখন নেপালকে আর দেখিতে পাইল না, তখন কি ভাবিয়া জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া ক্ষিপ্তের মতন চেঁচাইয়া উঠিল, দরোয়ান, দরোয়ান।

দরোয়ান নীচে হইতে হাঁক দিল, হুজুর।

রাখাল সেইখানে দাঁড়াইয়াই বলিল, বাহার আও, বাহার আও। তারপরে উপর হইতে দরোয়ানকে দেখিতে পাইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, ওই বাবুলোককো জল্দি বোলাও—জল্দি বোলাও।

দরোয়ান নেপালকে দৌড়িয়া গিয়া ডাকিয়া আনিল। নেপাল রাখালের কাছে আসিতেই রাখাল ব্যস্ততার সহিত হাত পাতিয়া বলিল, দে, দে, নোটগুলো দে। ও আর নিয়ে যেতে হবে না! বড়দা জান্‌তেই পারবে—তুই কোত্থেকে টাকা পেয়েছিস্। অনেক গালাগালি দেবে আবার তোকে। থাক্—কাজ নেই ও পাপ নিয়ে গিয়ে। মা'র কাপালে যা আছে তাই হবে।

নেপাল আর দ্বিরুক্তি করিল না। রাখালের হাতে নোটগুলি ফিরাইয়া দিল।

আরও দুইদিন নেপাল রাখালকে ডাকিতে আসিয়াছিল কিন্তু রাখাল যায় নাই। শেষে একদিন কি ভাবিয়া রাখাল সকালে মাকে দেখিতে গেল। সাহস করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে পারে নাই। কাহাকে ডাকেও নাই। বাড়ীর কেহ জানিতও না—রাখাল সেদিন অযাচিত বাড়ীমুখো হইবে। একলাটি বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাখাল কেবলি পায়চারি করিতে লাগিল।

সরোজিনীর অবস্থা দিন দুই বড়ই খারাপ। যায় যায় করিয়া

তাঁর মহাপ্রাণ তাপ জর্জ্জরিত দেহে ধুক্ ধুক্ করিতেছে। গোপাল চারদিন আফিসে যাইতে পারে নাই। সপরিবার দিবারাত্র মায়ের কাছে বসিয়া থাকে। সরোজিনীর ইচ্ছা একবার রাখালকে দেখিয়া যায়। সে অভিমানে চলিয়া গিয়াছে। গোপাল একবার তাকে ডাকিতে গেলেই সে চলিয়া আসিবে। প্রাণের অন্তিম ইচ্ছাটা আর তিনি মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন না। গোপালের দিকে কেবলি তাকাইয়া থাকেন। সরোজিনীর চোখের দৃষ্টিতে প্রাণের আকাঙ্খা প্রকাশ পায়, গোপাল কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে না।

উপরের বারাণ্ডা হইতে অপর্ণা রাখালকে দেখিতে পাইল। সে ছুটিয়া আসিয়া নীলিমাকে চুপি চুপি বলিল, বৌদি, বৌদি, মেজদা এসেছে ?

নীলিমা আর অপর্ণাকে ভাল করিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া রাখালকে ডাকিতে লাগিল। রাখাল দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। নীলিমার ডাকে তার পা আর চলিতেছে না। রাখাল বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে চায় না দেখিয়া নীলিমা বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

নীলিমা বলিল, এসনা—ঠাকুরপো ? আর মাকে কেন কাঁদাচ্ছ ? যথেষ্ট হয়েছে।

রাখাল ধীরে ধীরে বলিল, হাত ছাড় বৌদি, যাচ্ছি।

সরোজিনীর মাথার কাছে গোপাল বসিয়া আছে দেখিয়া রাখাল আর ঘরে ঢুকিল না, বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল। গোপাল ঘর হইতে দেখিতে পাইয়াছে—রাখাল আসিয়াছে। তাহার জন্য সে ঘরে ঢুকিতে পারিতেছে না, এটাও বুঝিল। গোপাল আর সরোজিনীর কাছে বসিতে পারিল না। নেপালকে এই বলিয়া উঠিয়া গেল, নেপাল, মায়ের কাছে একটু ব'স্—আমি আসছি।

গোপাল ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলে রাখাল ঘরে ঢুকিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল। সাহস করিয়া সে আর সরোজিনীর পাশে গিয়া বসিতে পারিল না। সরোজিনী রাখালকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন ; মুখে কোন কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ এমনি তাকাইবার পর সরোজিনী কহিলেন, রাখাল, আমাকে আজ দেখ্‌তে এসেছ ? রাখাল একথার উত্তর দেয় না—চুপ করিয়া থাকে।

সরোজিনী বলিলেন, দেখ, রাখাল, তোমার পরে দু দুটো ছেলে আমি হারিয়েছি ; একটা বারো বছরের, একটা সাত বছরের। পুত্রশোকটা আমার সহ্য আছে। মনে করেছিলুম, তোমার মৃত্যু-সংবাদটা আমি পেয়ে মর্‌ব—তবে আমার মরণে শান্তি হবে ; কেননা তোমায় আমি দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছিলুম ; তোমার শাস্তি সাজাটা আমি মা বলে আমার বুকে বেশ বাজ্‌বে। তুমি এখনো অনেক জল্‌বে পুড়্‌বে—এ যেন আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। সেইটাই আজ আমার মর্‌বার সময় বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে। হাজার

হলেও তুমি ছেলে। তোমাকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে আমি মর্‌তে পার্‌তুম তবেই নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু, তা আর হ'ল না।

অপর্ণা, নীলিমা, নেপাল সরোজিনীর চারি ধারে বসিয়া আছে। রাখাল এক কোণে দাঁড়াইয়া মুখ নত করিয়া সরোজিনীর কথাগুলো শুনিতে লাগিল। একটা কথারও প্রতিবাদ করিল না।

সরোজিনী আবার বলিলেন, বাড়ী, ঘর যে সব আমাদের ঘুচে গেছে, ভগবান্ তা ভালই করেছেন। নইলে ত এই ভা'য়ে ভা'য়ে লাঠালাঠি করে মর্‌তে। সে আরও জ্বালা। শুন্‌তে পাই—তোমার এখন খুব পয়সা হয়েছে। গোপাল তার বাপেরি মত গরীব কেরাণী। হয়তো তোমার সঙ্গে পেরে উঠত না।

গোপাল বাহির হইতে সমস্ত শুনিতেছিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল, কেন মা, ওসব কথা আর তুল্‌ছ? ভগবানের নাম কর না।

সরোজিনী কহিলেন, তোমাদের মত ছেলের মা যে, তার ভগবানের নাম করা হয় না।

গোপাল রাখালের পাশেই আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথম রাখালকে দেখিতে পায় নাই। তারপর রাখালের গায়ে হাত ঠেকিতেই—গোপাল চাহিয়া দেখে রাখাল নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করিয়া গোপাল সেস্থান হইতে অন্যত্র সরিয়া গেল।

সরোজিনী আর বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতই তাঁর এক একটা জ্বলন্ত বাণী মুখ দিয়া বাহির

হইতেছিল বটে; কিন্তু তাহা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে নাই। সমস্তই রাখালের অভিশপ্ত শিরে আসিয়া বর্ষিত হইতে লাগিল।

সেইদিন বেলা একটার সময় সরোজিনীর মর্ত্ত্য জীবন শেষ হয়। মরিবার সময় তিনি সকলের হাতের জল পাইয়াছিলেন—কেবল রাখালের পান নাই। নীলিমা রাখালকে অনেক করিয়া বলিল, ঠাকুরপো, মা'র মুখে একটু জল দাও। রাখাল তাহা শুনিয়াও শুনিল না। তাহার হাতের জল পাইয়া যদি সরোজিনীর পরলোক নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে রাখাল আর মা'র মুখে জল দিল না। তাহার অন্তরই যেন তাহাকে বার বার নিষেধ করিতে লাগিল।

মায়ের বিহনে অপর্ণা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে কেহই থামাইতে পারে না। কাঁদিতে কাঁদিতে অপর্ণা ছুটিয়া আসিয়া রাখালের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কেবলি তার মুখে এক কথা, মেজদা, তোমার জন্যেই মা মরে গেল। আমরা তোমার জন্যেই আজ মাকে হারালুম। তুমিই আমাদের মাকে মেরে ফেললে।

শ্মশানে সরোজিনীর দেহের সৎকার শেষ হইয়া আসিয়াছে। চিতা নির্ব্বাপিতপ্রায়। রাখাল নেপালের হাতে কিছু টাকা দিয়া বলিল, আমাদের তিনখানা সাদা ধুতি উড়ুনি আর এই যাঁরা এসেছেন এঁদের এক এক খানা করে কাপড় ব্যবস্থা করে কিনে নিয়ে আয়।

যথাসময়ে নেপাল সমস্তই কিনিয়া আনিল। গোপাল মায়ের অস্থি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিয়া নেপালকে ডাকিয়া কহিল, নেপাল, এই টাকা নে। আমাদের কাপড় কিনে আন্।

নেপাল বলিল, সব আনা হয়েছে।

গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, কে আন্‌লে?

নেপাল বলিল, আমি।

গোপাল প্রশ্ন করিল, কে টাকা দিলে?

নেপাল বলিল, মেজদা।

গোপাল বিরক্ত হইয়া রাখালকে শুনাইয়া নেপালকে বলিল, কেন?—আমি মাকে এদ্দিন দেখে এলুম আর এই শেষটুকু রক্ষে করতে পার্‌ব না। তার জন্যে কি আমায় অপরের কাছে ভিক্ষে মাগ্‌তে হবে? ও কাপড় আমি পর্‌তে চাই না। ও যা হয় করুক। তুই আলাদা সমস্ত কিনে নিয়ে আয়।

রাখাল গোপালের কথাটা শুনিতে পাইলেও অন্যমনে দাঁড়াইয়া রহিল। নেপাল গোপালের মুখের ওপর আর কিছু কথা কাটাকাটি

করিতে পারিল না। একবার রাখালের পানে তাকাইয়া সে চলিয়া গেল।

নেপাল ফিরিয়া আসিলে তিনভাই গঙ্গায় ডুব দিয়া শোকোত্তরীয় ধারণ করিল। গোপালের অর্থে নেপাল যে-সব বস্ত্র কিনিয়া আনিয়াছিল—রাখাল তাহার মধ্যে একখানা লইয়া গায়ে জড়াইল। বাড়ী ফিরিবার সময়—আগেকার কাপড়গুলো কি হইবে —একথা রাখালকে নেপাল জিজ্ঞাসা করিলে, রাখাল গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, কি আর হবে? ওই মুদ্দফরাসদের দিয়ে দে।

রাখাল বাড়ী ফিরিয়াই আর রহিল না। নীলিমা অনেক করিয়া বলিল, অন্ততঃ তিনটে দিন থেকে যাও, ঠাকুরপো। এর ভেতর যেতে নেই। রাখাল সে কথায় কাণ দেয় নাই। নীলিমার শত উপরোধ, অনুরোধ জোর করিয়া ঠেলিয়াই রাখাল চলিয়া আসিল।

একমাস রাখাল যথাবিধি অশৌচ পালন করিয়াছিল কিনা— তাহা বলিতে পারি না। করিলেও সে আর বাড়ী যায় নাই। সরোজিনীর শ্রাদ্ধে—নীলিমা নেপালের হাতে চিঠি দিয়া রাখালকে আসিতে বলিল, কিন্তু রাখাল আসিল না।

চোদ্দ

রামধনবাবু গোপালের শ্বশুর। বাঙলা দেশের এক পল্লীগ্রামে একটা ছোট জমিদারী চালাইয়া তিনি মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন। বৎসরের মধ্যে তাঁকে ছয় মাস আদালতে যাতায়াত করিতে হয়। দেওয়ানী ফৌজদারী একটা না একটা মামলা তাঁহার লাগিয়াই আছে। তাঁহার অভিজ্ঞতা এতদূর জন্মিয়াছে যে, তিনি বিচারকালীন জজের চোখের চাহনি দেখিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন, কোন্ পক্ষের অনুকূলে জজ রায় দিবে।

সরোজিনীর মৃত্যুর পর রামধনবাবু একবার ঝি জামাইকে দেখিতে আসিলেন। নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া—গোপালের মাতৃদায় উদ্ধার করিয়া দিলেন। দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে তাঁহার ইচ্ছা হইল, গোপালের পৈতৃক সম্পত্তির একটা কায়েমী ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যান। এমনি মতলব আঁটিতে লাগিলেন—যাহাতে রাখাল কিংবা রাখালের উত্তরাধিকারিগণ ভবিষ্যতে কিছু না করিতে পারে। তিনি গোপালকে বুঝাইলেন, তাহার দুইটি কন্যা হইয়াছে—তাহাদের প্রতিপালন করিতে হইবে। বয়স্থা ভগ্নীটী তাহারি ঘাড়ে পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাকে আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। সাত ঘাট বাঁধিয়া সংসারধর্ম্ম করিতে হইবে। রাখালকে বিশ্বাস নাই—সে

তাহাকে নানা উপায়ে জব্দ করিতে পারে। কোনদিন হয়ত সে বলিয়া বসিবে, পৈতৃক সম্পত্তি বুঝাইয়া দাও। মায়ের গায়ের গহনা—তারও অংশ আমার চাই। তখন গোপালকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান না হইলে চলিবে না।

রামধনবাবু নীলিমাকেও বলিলেন, তুমি মা এবার শক্ত হও। ঘর সংসার এখন তোমার ঘাড়েই পড়্‌ল। বাড়ীখানা যাতে তোমার নামে লিখে রাখে—জামাইকে বলে এই ব্যবস্থাটুকু করে নাও। ভবিষ্যত ভেবে চল মা—ভবিষ্যত ভেবে চল।

নীলিমা অত ভাবিতে পারে না। সে তাই উত্তর দিল, বাবা, যা কপালে আছে—তা হবেই। বাড়ীই লিখে দাও আর রাজত্ব লিখে দাও—কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পার্‌বে না।

রামধনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আহাহা, বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, মা, বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। ওই তোমার মেজঠাকুরপো তফাত রইল; তারপর ওই ছোটটা যদি গিয়ে আবার তার দলে মেশে তাহলে একা তখন কোন্‌ দিক্‌ সামলাবে? আর যা দেখ্‌ছি—ছোটটা ত বকে গেছে। মনে কর্‌ছ—ও তোমার সংসারে থাক্‌বে; কখনই না; দেখে নিও এই বুড়োর কথা—মিথ্যে কিছুতেই হবেনা। ভেতর ভেতর রাখালের সঙ্গে কিছু ষড়যন্ত্র কর্‌ছে কি না—তাই বা কে জানে।

নীলিমা হাসিয়া কহিল, বাবা, আমার মাথায় ও সব ঢুক্‌বে

না। আমি ও সব বুঝ্‌তে চাই না। দুবেলা সংসারে গতর পিষে খাটব—শাক ভাত যা হয় হাসিমুখে সকলে মিলেমিশে মুখে তুলে দিন কাটাব—বাস্, এর বেশী সুখ আর আমার দরকার নেই।

রামধনবাবু দেখিলেন, নীলিমার বৈষয়িক জ্ঞান খুবই অল্প। তখন তাঁহাকে আরও শক্ত হইতে হইবে। তাই অনেক রাত পর্য্যন্ত একদিন গোপালের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করিলেন। পৈতৃক বাড়ী বেচিয়া সেই অর্থে গোপাল এই বাড়ী কিনিয়াছে। রাখালের অংশ কিছু নাই বলিলে চলিবে না। সে যে কোন সময়ে তাহা দাবী করিতে পারে। স্থির হইল, রাখালকে একদিন ডাকিয়া আনিতে হইবে। পিতার মৃতুর পর হইতে—গোপাল কেমন করিয়া এই সংসার চালাইয়া আসিয়াছে—ইহার একটা মিথ্যা হিসাবও রাখালকে দেখান হইবে। কতটাকা গোপাল সংসারের জন্য রামধনবাবুর নিকট হ্যাণ্ডনোটে কর্জ্জ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে অপর্ণার বিবাহের জন্য আরো তাহাকে কত কর্জ্জ করিতে হইবে—ইহার একটা পাকা কথাবার্ত্তা তাহার সহিত কহিয়া রাখা ভাল। অবশ্য রামধন বাবু গোপালের জন্য একটা মিথ্যা হ্যাণ্ডনোট রাখালকে দেখাইতে পারিবেন। রাখাল সমস্ত শুনিয়া ইহার কি উত্তর দেয় একবার জানিয়া রাখা উচিত। যদি এই সব দেখিয়া সে তার নিজের অংশ গোপালকে লিখিয়া দিতে রাজী হয়, তাহা হইলে ভালই হইবে; অন্যথায় রামধনবাবু ঝি জামাইয়ের কল্যাণের জন্য রাখালের সহিত

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে আদালতে আশ্রয় লইতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

শ্বশুরের পরামর্শটা ভাল বলিয়া বুঝিলেও গোপাল বলিল, আমি রাখালকে ডাকতে পারব না। তার সঙ্গে আমি কথা কইতেও চাই না।

রামধনবাবু বলিলেন, তোমায় কিছু বলতে হবে না। সে এলে আমিই তাকে সব বুঝিয়ে বলব। তুমি কেবল সায় দিয়ে যাবে।

গোপাল কহিল, সে আসবে কেমন করে? তাকে এ বাড়ীতে আসতে বলবে কে?

রামধনবাবু বলিলেন, নেপালকে একদিন রাখালের কাছে পাঠিয়ে দাও। বিশেষ দরকার আছে, এই বলে সে তাকে ডেকে আনুক।

গোপাল কহিল, আমি পছন্দ করি না, নেপাল তার বাড়ীতে যায়। তার পয়সা আছে, নেপাল যদি সেই লোভে ভুলে থাকে—তাহলে ও সেখানে গিয়ে থাকুক গে। আমারও ভাবনা কমুক।

রামধনবাবু একটু থামিয়া বলিলেন, তাহলে এক কাজ কর। তার বাড়ীর ঠিকানা জেনে তাকে আসতে একখানা চিঠি লেখ।

গোপালের এ যুক্তিও মনোমত হইল না। তাই কিছু না বলিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

শনির দশা

রাখাল তখনও সীতানাথবাবুর পাড়া ছাড়ে নাই। ইহার দিন পনের পরে নেপাল একদিন রাখালের সহিত চুপি চুপি দেখা করিতে গেল। উপরে উঠিয়া রাখালের ঘরে ঢুকিতেই দেখে, রাখাল পেটে একটা বালিশ চাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। চোখে মুখে একটা বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। নেপালকে দেখিতে পাইয়া রাখাল বলিল, নেপাল, এত কাণ্ড কর্‌বার দরকার কি ছিল? তা বেশ—ভালই হয়েছে। তুমিও এসেছ, বস। আমার উকিলেরও এইবার আস্‌বার সময় হয়েছে।

নেপাল একথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। রাখালের দিকে চাহিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখাল কোল হইতে বালিশটা সরাইয়া বলিল, বড়দা কি সামান্য বাড়ী ঘরের অংশ নিয়ে আমার সঙ্গে মাম্‌লা মকদ্দমা কর্‌তে চায়? এ সব পাটোয়ারী বুদ্ধি বড়দার মাথায় কে জোগাচ্ছে—বৌদি? না, বৌদির ত সে রকম স্বভাব নয়।

একটা উত্তরের আশায় রাখাল চাহিয়া আছে দেখিয়া নেপাল কহিল, কি বল্‌ছ, মেজদা? কিছু ত বুঝ্‌তে পারছি না।

রাখাল একটু হাসিয়া বলিল, বুঝ্‌বে—দাঁড়াও।

চাকর আসিয়া জানাইল, উকিলবাবু আসিয়াছেন।

রাখাল তাঁহাকে ঘরে লইয়া আসিতে বলিল।

রামধনবাবু ইতিপূর্ব্বে গোপালের হইয়া রাখালকে একখানা

উকিলের চিঠি দিয়াছেন এই মর্ম্মে যে, রাখাল তাহার পৈতৃক সম্পত্তির অংশ তার বড় ভায়ের নিকট হইতে বুঝিয়া লউক। গোপাল আর কিছু জড়ীভূত করিয়া রাখিতে রাজী নয়। সে এখন সমস্ত পরিষ্কার করিতে চায়। ইত্যাদি।

নেপাল এ ব্যাপার জানিত না। তাহার পরামর্শ লইতে হইবে, রামধনবাবু তাহা কোনও দিন উচিত বোধ করেন নাই। নেপাল এ সমস্ত শুনিয়া একবারে অবাক হইয়া গেল।

রাখাল এ চিঠির উত্তর দিবার জন্য তাহার উকিলকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই দিনই চিঠির জবাব গেল। রাখাল লিখিয়া দিল—পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার কোন অধিকার নাই। ভবিষ্যতে তাহার বা তাহার উত্তরাধিকারিগণের কোনও অধিকার বা দাবীদাওয়া থাকিবে না। আইনতঃ যদি তার কিছু প্রাপ্য থাকে, সে তাহা জ্ঞানতঃ ত্যাগ করিতেছে। আর এ যাবৎ গোপাল রামধন বাবুর নিকট হইতে যে টাকা ধার করিয়া সংসার চালাইয়া আসিয়াছে—তাহার সঠিক পরিমাণটা জানিতে পারিলে রাখাল তাহা পরিশোধ করিতে অনিচ্ছুক হইবে না।

রাখালের নামে চিঠি যেমন রেজেষ্ট্রী করিয়া পাঠাইয়াছিল, রাখালও তেমনি তাহার উত্তর রেজেষ্ট্রী করিয়া পাঠাইয়া দিল।

উকিলবাবু কাজ মিটাইয়া চলিয়া গেলে রাখাল নেপালকে বলিল, দেখ্ নেপাল, অপর্ণার জন্যে মনটা কেমন করে। বড় ইচ্ছে

ছিল তাকে বেশ সাজিয়ে পার করব। তা যাক—অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে; আমি নিজে আর কিছু দোব না। দিতে আমার হাত উঠ্‌বে না। তুই বৌদিকে আমার নাম করে বলিস, মা'র গায়ের গয়না যদি কিছু থাকে, সে গুলো যেন অপর্ণাকে দিয়ে দেয়। জানি, বৌদি তাতে কিছু আপত্তি কর্‌বে না। আর একটা কাজ করিস্, বড়দা যেন পাপ বিদেয় কর্‌বার মত যা ত করে অপর্ণাকে বিদেয় না করে—এইটার দিকে একটু নজর রাখিস্।

এত সহজে যে রাখাল তাহার সমস্ত অধিকার ছাড়িয়া দিবে, ইহা রামধনবাবু স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। পত্রের উত্তর পাইয়া তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল, আর বেশী দিন রহিলেন না। জমিদারী দেখিতে নিজের দেশে চলিয়া গেলেন।

পনেরো

সুরুচির বিবাহের পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুরুচি এখন খুব কমই পিত্রালয়ে আসে। আসিবার অবসর তাহার নাই। নিজের সংসার সে ফেলিয়া আসিতে পারে না। সুরুচিই এখন সে—সংসারে গৃহিণী। নিতাই নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকে। মাথার উপর কেহ নাই দেখিয়া দূরসম্পর্কের এক মামা আসিয়া নিতাইকে সংসারী করিয়া দিয়া গিয়াছেন। নিতাই ছাড়া আপনার বলিতে কেহ নাই, তবু পর লইয়াই সুরুচি ব্যস্ত। ভবানীপুরে তাহার শ্বশুর বাড়ী। বাড়ীতে লোক জনের অভাব ছিল না। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিতাই যখন বেশ দুপয়সা উপায় করিতে লাগিল, তখন তাহার সংসারও দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সুদূর পল্লীগ্রামে নিতাইয়ের এক সম্পর্কের বোন আছে, তাহার ছেলেটির লেখাপড়া সেখানে ভাল হয় না। তাই ভাগ্নে আসিয়া মামার আশ্রয় নিল। নিতাইয়ের এক দূর সম্পর্কের বৃদ্ধ কাকা অনেকদিন বাতে ভুগিতেছেন, তিনিও চিকিৎসার জন্য নিতাইয়ের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ আবার একটা ভাল চাকরীর আশায় নিতাইয়ের শরণাপন্ন হইল। যতদিন না নিতাই তাহাদের একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া

দেয় ততদিন তাহারা কোথাও যাইবে না—তাহার সংসারেই উপদ্রব করিবে, এমনও জানাইয়া রাখিল। সংসারে তাই পোষ্য অনেকগুলি। নিতাই কিছুই বলে না। সুরুচিও তাহাতে বিরক্ত নয়। সকলের সেবা যত্নের পাছে ত্রুটি হয়, এই জন্য বাড়ীতে ঝি চাকরেরও অভাব নাই। একটা বৃহৎ সংসার। যেন দুইটি তরুকে জড়াইয়া অনেকগুলি আগাছা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। কাহাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কাহাকে রাখিবে, সকলেরই সমান অধিকার। বাহির হইতে দেখিলেই মনে হয়, সুরুচির সংসার আত্মীয়-স্বজনের একটা অতিথশালা বই আর কিছু নয়। সুরুচির কে আত্মীয়, কে অনাত্মীয় ইহা বুঝাও দুষ্কর। সুরুচির ভালবাসায় জোয়ার ভাটা ছিল না। হরিদ্বারের গঙ্গাস্রোতের ন্যায় একটানেই তাহা প্রবাহিত হইয়া চলে। তাহার মুখে যেই আসিয়া পড়ে সেই নিজেকে ধন্য মনে না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং সংসারে সুরুচির আসন ছিল সকলের উচ্চে। সামান্য ঝি চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া আপনার স্বামীটিকে পর্য্যন্ত নিজের স্নেহ, ভলোবাসা, দয়া, মায়া ও প্রেমের আকর্ষণে ঠিক টানিয়া রাখিত। তাই তাহার সংসারের রথ তীর বেগে দৌড়াইত; পথে তেমন বাধা বিঘ্নের ভয় কিছুই ছিল না।

সীতানাথবাবুর আর্থিক অবস্থা এখন খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

কারবার আর বেশ ভাল চলে না। সুরুচিই ছিল যেন তার ঘরের লক্ষ্মী। তাঁহার লক্ষ্মী পরের ঘরে চলিয়া গিয়াছে, একথাটা তিনি সুরুচির বিবাহের পর হইতে সকলকেই বলিয়া আসিতেন। এইরকম লক্ষ্মীছাড়া হইবার ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই তিনি সুরুচির বিবাহ অল্পবয়সে দেন নাই। একটু শিক্ষা, একটু সাংসারিক অভিজ্ঞতা সুরুচি যাহাতে পায়; সে চেষ্টা তিনি খুবই করিয়া আসিয়াছেন।

কি ভাবিয়া রাখাল অনাথালয়ে একটা মোটা রকম টাকা দান করিয়া বসিল। তাহাতে ঊষা ও তাহার মা চটিয়া গেল। তাহারা আর দেরী করিল না। সেইদিনই মায়ে ঝিয়ে রাখালকে খুব শুনাইয়া দিল। রাখালের আর এ হীনতা স্বীকার করিতে, এ দাসত্বে মাথা নত রাখিতে ইচ্ছা রহিল না। সেইদিনই দ্বিরুক্তি না করিয়া উকিল ডাকিয়া লেখাপড়া করিয়া তাহাদের সম্পত্তি তাহাদের ফিরাইয়া দিল। তাহারাও বাঁচিল। নগদ টাকা যা অবশিষ্ট ছিল তাই আর দুখানা বাড়ী ফিরিয়া পাইয়া তাঁহারা রাখালকে তাড়াইয়া দেয় নাই। বেশ মিষ্ট কথায় রাখালকে বুঝাইল, সে তাহাদের কাছেই থাকিবে। যখন যাহা দরকার হইবে চাহিয়া লইবে।

রাখালের মদ খাওয়া চাই। খাইতে গেলে অর্থেরও প্রয়োজন। সেও আর কোন কথা কহিল না। ঘৃণা, লজ্জা, মনের জোর সব

ভাসাইয়া তাহাদের কাছেই পড়িয়া রহিল। কোথায় বা যাইবে! ইদানীং তাহার আবার নানা রোগ ধরিয়াছে। তাহার যকৃতে ঘা হইয়াছে। অতিরিক্ত মদ খাওয়ায় সম্প্রতি খুক্ খুক্ কাশিও দেখা দিয়াছে। একটু একটু জ্বর সর্ব্বক্ষণই ভোগ হয়। আরও অনেক রোগের বীজানু তাহার রক্তে মিশিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে—তাহার দেহখানা যেন একটা ব্যক্তিগত হাঁসপাতাল। রাখাল এ সব ভ্রূক্ষেপই করে না। কোন ব্যাধি আরামের জন্য তাহার একটু চিন্তাও নাই। অকেজো জীবনটা এখন তার রক্ত মাংসের খোলস ফেলিয়া কবে চলিয়া যাইবে—এই আশায় যেন সে উন্মুখ হইয়া থাকে।

রাত তখন ন'টা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সেজন্যে কেহ আর বড় একটা বাহির হইতে চায় না। রাস্তায় এক হাঁটু জল তখনো দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে খুব জোর বৃষ্টি হইয়াছিল।

এমন সময় একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী কুমারটুলীর ভিতর প্রবেশ করিল। এ-গলি ও-গলি ঘুরিয়াও ঠিক জায়গায় পৌঁছিতে পারিতেছিল না। অবশেষে একটা বস্তির কাছে আসিয়া গাড়ী থামিল। আরোহী একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষ। গাড়োয়ানকে

ডাকিয়া তাহারা কি বলিল। গাড়োয়ান একটা ছাতা মাথায় দিয়া সেই বস্তির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বাবু, এইখানে নামুন। খোঁজ পাওয়া গেছে। আমি দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—আসুন। কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী আশায় উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এইখানেই আছে? কোথায় —কোথায়—কোন্ ঘরখানায়?

তাড়াতাড়ি দুজনে নামিয়া পড়িল। গাড়োয়ান আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। খানিকটা পথ গিয়াই গাড়োয়ান একখানা খোলার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, আমি জিগ্যেস করে জেনেছি, মা, সে লোক এরির ভেতরই আছে।

আশপাশের ঘর হইতে নরনারী অনেকেই উঁকি মারিতে লাগিল। 'এরা দু'জন কারা', এই লইয়া তাহারা গুজ্ গুজ্ করিয়া কি বলাবলি করিল, তাহা কিছু শোনা গেল না। স্ত্রীলোক-টির আর বিলম্ব সহিল না। সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঘর অন্ধকার। কে একজন শুইয়া শুইয়া কাত্রাইতেছে—তার স্বর বেশ শুনিতে পাইল। একটা দুর্গন্ধে ঘরখানা পূর্ণ। মাটির মেঝ; তাহার উপর বর্ষা নামিয়াছে কাজে কাজেই সে ত স্যাঁৎ স্যাঁৎ করিবেই। স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া পুরুষটিকে বলিল, ওগো, ওই গাড়োয়ানকে একটা বড় বাতি নিয়ে আস্তে বল। ঘরের ভেতর কিছুই দেখা যায় না। গাড়োয়ান

তাড়াতাড়ি বাতি কিনিয়া আনিল। দিয়াশালাই ভদ্রলোকটির পকেটেই ছিল—ধরাইতে আর দেরী হইল না। গাড়োয়ানকে তাহারা গাড়ীর ভিতর অপেক্ষা করিতে বলিল। তারা না গেলে সে যেন চলিয়া না যায়—এ কথাও জানাইয়া রাখিল।

লোকটির হাতে বাতি দিয়া স্ত্রীলোকটি আবার ঘরে ঢুকিল। দরজা খুলিতেই একটা ঠাণ্ডা বাতাস ভিতরের দুর্গন্ধ বাতাসের সহিত মিশিয়া গেল। তাহাতে ছেঁড়া কাঁথাখানা একটু ভাল করিয়া জড়াইয়া ভিতরের লোকটি আবার খুক্ খুক্ করিয়া কাশিয়া উঠিল। এবার বাতির আলোয় মুখ দেখিয়া সুরুচি বুঝিতে পারিল, রাখালই কাশিতেছে। নিতাই সুরুচির সঙ্গে আসিয়াছে।

কাছে আলো আনিতেই রাখাল চোখ চাহিল। সুরুচিকে দেখিতে পাইয়া সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সুরুচিও থাকিতে পারিল না। তাহার চোখও সজল হইয়া উঠিল। নিতাই ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে। দেখিবার মত কোথাও কিছুই নাই। এক কোণে গোটাকতক মদের বোতল খালি পড়িয়া আছে। একদিকে মাটির কলসীতে খাবার জল; একখানা থালা, একটা বাটি তাহরি পাশে রহিয়াছে। গেলাসটা সেস্থানে দেখিতে পাইল না। সেটা দেখিল মাথার কাছে। মেঝের উপর একটা অপরিষ্কার বিছানা। ছিন্ন কাঁথাই তাহার আবরণ। তেল খাইয়া খাইয়া চট্ ধরিয়াছে—এমন একটা

বালিশে রাখাল মাথা দিয়া শুইয়া আছে। ঘরের ভিতর একটা আলো পর্য্যন্ত নাই। রাখাল মাঝে মাঝে কাশিতেছে। মুখে যাহা উঠিতেছে তাহা নিকটেই একটা মাটির ভাঁড়ে ফেলিয়া রাখিতেছে।

সুরুচি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। কেমন থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাখাল অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, মা, নেপালের কাছে খবর পেয়ে এসেছ তাহলে? আমি মনে করেছিলুম—বোধ হয় আর এজীবনে দেখা হবে না। তারপর নিতাইয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, ইনি কে? একটু থামিয়া বলিল, ও—ও—বুঝেছি। মা, তোমাদের আজ বস্‌তে বল্‌ব এমন অবস্থা আমার নেই! দয়া করে এসেছ যে—

রাখাল আর বলিতে পারিতেছে না। তাহার বুকে কেমন টান ধরিতে লাগিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আজ কথা কহিবেই। একটু জোর করিয়া কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া নিল। মাটির ভাঁড়টা নিজের হাতে ধরিয়া যেটুকু মুখে উঠাইয়াছিল তাহা তাহাতে ফেলিয়া রাখিল। সুরুচি বেশ লক্ষ্য করিয়াই দেখিল, সেটুকু লাল রক্ত ছাড়া কিছুই নয়। দেখিয়াই সুরুচি শিহরিয়া বলিল, ইস্‌।

রাখাল কহিল—আর ইস্‌। মায়ের অভিশাপ ছিল, মা—মায়ের অভিশাপ ছিল; মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মর্‌ব। তাই আজ এই দশা।

রাখাল আবার থামিল। চোখ দিয়া তার জল গড়াইয়া পড়িতেছে। সুরুচি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। রাখালের মাথার কাছে বসিয়া তাহার বুকে হাত বুলাইতে লাগিল।

সুরুচি জিজ্ঞাসা করিল, তোমার এমন অবস্থা হ'ল কেন? তুমিতো রাজা ছিলে।

রাখাল বলিল—হাঁ মা, রাজাই ছিলুম এইবার তার সাজা পাচ্ছি।

সুরুচি জিজ্ঞাসা করিল—তোমার সম্পত্তি, টাকাকড়ি কিহ'ল?

রাখাল হাত নাড়িয়া উত্তর দিল, সে সব ভোর বেলার স্বপ্নের মত ভেঙে গেছে।

—তারা কোথায়?

—কারা?

—তোমার—

—ও—আমার পরিবার ও শাশুড়ীর কথা বল্‌ছ?

—হাঁ।

—তারা পালিয়েছে। সব তাদের ফেলে দিয়ে দিয়েছি। আর তারা আমায় দেখ্‌বে কেন?

সুরুচি আঁচল দিয়া নিজের চোখ পুঁছিতে লাগিল। রাখাল সেটা লক্ষ্য করিয়া বলিল, কাঁদছ কেন, মা? আমি যে সারা জীবন লোককে কাঁদিয়েই এলুম।

সুরুচি কহিল—দেখ, তোমায় আর এখানে থাকতে হবে না। —আমাদের সঙ্গে চল।

রাখাল বলিল, আর কোথায় যাব, মা? আমার মাটি এই খানেই কেনা আছে।

সুরুচি জিজ্ঞাসা করিল, তোমায় এখানে দেখে কে?

রাখাল বলিল, আমার ছোট ভাই নেপাল। সে সকাল হলেই আসে। সারাদিন কাছে থাকে। রাত্রে বাড়ী চলে যায়— থাকতে পারে না বড়দার ভয়ে। আমিও আর থাকতে দিই না। মনে করেছিলুম—তোমায় আর খবরটা দোব না। কিন্তু আর থাকতে পারলুম না। একবার তোমায় দেখবার বড় ইচ্ছে হ'ল। তাই নেপালকে দিয়ে আজই খবরটা পাঠিয়েছিলুম।

সুরুচি এ খবরটা সেদিন দুপুর বেলায় পাইয়াছিল। নিতাই আফিস গিয়াছে। তাই একা আসিতে পারে নাই। নিতাইকে পূর্ব্বেই তার ছেলের কথা সবই বলিয়াছিল। বাড়ী আসিতেই রাখালের এই অবস্থা জানাইয়া একবার রাখালকে দেখিতে যাইবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়া পড়িল। মন খারাপ—সুরুচির কিছু ভাল লাগিতেছিল না—নিতাইও তাহাকে কোন কথায় ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না। সুরুচি রাখালকে দেখিতে যাইবার জন্য কেবলি জিদ করিতে লাগিল। অবশেষে সেই রাত্রেই গাড়ী ডাকিয়া নিতাই সুরুচিকে লইয়া বাহির হইল। নেপালের দেওয়া

ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতেই তাহাদের অনেক সময় কাটিয়া গিয়াছে।

সুরুচি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তোমার কপালে এত কষ্টও লেখা ছিল!

রাখাল কহিল, এ আমার কর্ম্মভোগ—কষ্ট নয়; এ আমার প্রায়শ্চিত্ত, মা।

কথাটা শুনিয়া সুরুচি কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল, কি এমন পাপ করেছিলে তুমি?

রাখাল একটা যন্ত্রণায় কাতরাইয়া উঠিল, ওহো হো—পাপ করিনি? খুব পাপ করেছি। সব বল্‌তে পারছি না, মা—বড় বুকে লাগ্‌ছে—বড় কষ্ট হচ্ছে। তবে এইটা শুনে রাখ। সবচেয়ে আমার মহাপাপ, তোমায় 'মা' বলে ডাকা—যুবতী কুমারীর বুকে মাতৃত্ব জাগিয়ে তোলা।

সুরুচি মুখ নীচু করিয়া রহিল। রাখাল হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটু দম লইয়া আবার বলিল, মা, আমার আজ বড় আনন্দ হচ্ছে! সেদিন তুমি আমার কাছে মাপ চাইতে এসেছিলে; আজ আমায় মাপ কর, মা। কষ্ট অনেক পেয়েছি, মা—পাচ্ছিও অনেক। এই দেখ না—অবস্থা আমার কি হয়েছে। ঘরে একটা আলো জ্বাল্‌বার পয়সা নেই। পেটে কিছু দিতে পারি না। নেপালের দয়ায় কোনও গতিকে আজও টেঁকে আছি। আর সহ্য হয় না, মা—

আর সহ্য হয় না। উঃ—কেন সেদিন রাত্রে তুমি আমায় মর্‌তে দিলে না, মা? তাহলে যে আমার এ জীবনের শেষ এমন করে হত না। যাক্, যা ভাগ্যে ছিল হয়েছে। তোমায় কিন্তু এর শাস্তি নিতে হবে। আমি আস্‌ব; আমি তোমার যত্ন, আদর এখনও ভুলতে পারি নি। ভগবান্ যদি থাকে—আমি তার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি যেন, পরজন্মে তোমার কোলেই আস্‌তে পারি। তাহ্‌লে আর—তাহ্‌লে আর বোধ হয় কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌বে না।

রাখাল থামিল। কথা সে কহিতেছিল ক্ষীণ স্বরেই আর মুহুর্মুহুঃ দম লইয়া। সুরুচি যে আঁচলে রাখালের চোখ পুঁছাইতেছে, সেই আঁচলে নিজেরও চোখ পুঁছিতেছে। নিতাই এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। আর পারিল না; রাখালের পাশে আসিয়া বসিল। বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ পর্য্যন্ত কোন ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

রাখাল কোণের খালি বোতলগুলোর দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, ওই আমার ডাক্তার, ওই আমার মোক্তার সব।

বাহিরে বৃষ্টি তখনও থামে নাই। এবার বেশ জোর করিয়াই নামিল। জলের শব্দে ও বাতাসের গর্জ্জনে রাখালের কথা সব শোনা যায় না। নিতাই সুরুচির কাণে কাণে কি কহিল। সুরুচি রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি একবারও কি উঠে দাঁড়াতে পার না?

রাখাল বলিল, না, কেন ?

সুরুচি কহিল—আমাদের সঙ্গে যেতে।

রাখাল বলিল—আবার নিয়ে যাবে ? আবার কথা শুনবে ? রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে কি আবার জ্বলে পুড়ে মরবে ? না—আমি যাব না। একটু থামিয়া আবার বলিল, তোমায় আর কষ্ট করে আস্‌তে হবে না, মা। এ পাড়ায় ভদ্রলোক কেউ আসে না। রাত্রের অন্ধকারে যেমন এসেছ তেম্‌নিই চলে যেও। আর একটা কাজ কোরো মা। আমি মরে গেলে, নেপাল তোমায় খবর দেবে। খুব বেশী করে কাঠ দিয়ে আমায় দাহ কর্‌তে ব'ল। আগুনের দাপটে আমার সমস্ত রোগের বীজানু যেন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি যেন পরজন্মে সুস্থ সবল হয়ে তোমার কোলে আস্‌তে পারি। আর —আর একটা অনুরোধ, মা—নেপাল ছেলেমানুষ। সে আমার খুব করেছে। সে উপায় করে না। তাই বলছি, আমার দাহ খর্‌চাটা, মা, তুমিই দিও। এর জন্যে যেন তাকে আর অপরের কাছে হাত পাত্‌তে না হয়। আমার আর কিছু নেই। আমার চিতা সাজাবার জন্যে আমি দোব এই ছেঁড়া কাঁথা আর এই রুগ্ন দেহ।

শেষের কথাগুলো বলিতে বলিতে সে ছোট ছেলের মত কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সে কান্নায় পাষাণ প্রাণও কাঁদিয়া ওঠে। সুরুচি, নিতাই—কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। উভয়েই নীরবে ঝর্ ঝর্ করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। রাখাল

আর বেশী কিছু বলে নাই, বলিতে পারেও নাই। বলিতে গেলেই সে হাঁপাইয়া ওঠে আর কাশিতে কাশিতে মুখ দিয়া খানিক খানিক রক্ত বাহির হয়। 'মা, আমার দাহ খরচাটা তুমিই দিও মা, তুমিই দিও। আমি দোব এই ছেঁড়া কাঁথা আর এই রুগ্ন দেহ'— রাখালের এই শেষ কথাগুলো সুরুচির বুকের ভিতর কেবলি ধ্বনিত হইতে লাগিল। সুরুচির এক একবার মনে হয়—সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। কিন্তু তাহা পারিল না। সস্নেহ দৃষ্টিতে সে খালি রাখালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অশ্রুপ্রবাহে যখন দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া আসে তখন আঁচল দিয়া দু চক্ষু মুছিয়া লয়। কেন সে পূর্ব্বে রাখালের খোঁজ লয় নাই; রাখাল যে তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাকে মায়ের আসনে বসাইয়া আসিয়াছে; এই ভাবিয়া সুরুচি মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিল।

বাহিরে প্রকৃতির তাণ্ডবনৃত্য তখনও থামে নাই। বিদ্যুতের কশাঘাতে কে যেন তাহাকে আরও উত্তেজিত করিতেছে।

রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে। বস্তি নিস্তব্ধ। কেবল জলের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। রাখাল একবার কাশিতে কাশিতে ছটফট্ করিয়া উঠিল। কাটা ছাগলের মত একবার এপাশ একবার ওপাশ করিতে লাগিল। সুরুচি তাহার বুকে যতই হাত বুলায় সে ততই অশান্ত, অস্থির হইয়া পড়ে। নিতাইও তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া শান্ত করিতে পারিল না। কাশিতে

কাশিতে কি একটা মুখে উঠিয়াছে—সেটা রাখাল বাহির করিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। সুরুচি তাহা বুঝিতে পারিল। সে তাহার ডান হাতের আঙুল দিয়া রাখালের মুখের ভিতর হইতে একটা চাপ রক্তের ডেলা বাহির করিয়া আনিল। সেটা মাটির ভাঁড়ে রাখিতেই রাখাল কেমন নেতাইয়া পড়িল। সুরুচির হাতের আঙুল রক্তে লাল হইয়া আছে। সুরুচি বার বার জিজ্ঞাসা করিল, কি কষ্ট হচ্ছে; কি কষ্ট হচ্ছে তোমার? রাখাল তাহার কোন উত্তর দিতে পারে না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে। স্নেহ ভরে সুরুচি হাঁক্ পাঁক্ করিয়া মরে। রাখাল তাহাই দেখে আর ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদে। সুরুচি আঁচল দিয়া চোখের জল মুছাইয়া দেয়। কিন্তু সে জল আর থামে না। রাখালের কোন্ ব্যথার উৎস যেন আজ ফাটিয়া গিয়াছে তাই তাহার চক্ষে এত জল। কোন্-দিনের কথা আজ তাহার মনে পড়িতেছে তাই সে এমন নির্ব্বাক্ —নীরব। কাহাকে কষ্ট দিয়াছে—কাহাকে কাঁদাইয়াছে, সেই কথা ভাবিয়াই সে অমন ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে।

সুরুচিও খানিকক্ষণ নীরবে রাখালের পানে চাহিয়া রহিল। রাখালের অপলক নেত্র যেন প্রতিবারই সুরুচিকে নীরবে এই কথা জানাইয়া দিতে লাগিল, 'ওমা, আমার দাহ খরচাটা তুমিই দিও; আমার চিতা সাজাতে আমি দোব এই ছেঁড়া কাঁথা আর এই রুগ্ন দেহ।' কথাগুলো সুরুচির বুকে কেবলি আছাড় খাইয়া

ফিরিয়া আসে। তারির আঘাতে তার কোমল হৃদয়ে সেই আদ্যন্ত সমস্ত ব্যাপার মনে পড়িয়া যায়। ভাবী আশঙ্কায় সুরুচির বুকখানা কাঁপিয়া ওঠে। তারপর রাখাল ধীরে ধীরে তার শীর্ণ হাত দুখানা তুলিয়া সুরুচিকে ইঙ্গিতে কি বলিতে উদ্যত হইল; কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা সজল ঘুর্ণি হাওয়ায় বাতির আলো নিভিয়া যাওয়াতে সুরুচি কিছু দেখিতে বা বুঝিতে পারিল না। সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিতাইয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ওগো ওগো, শীগ্‌গীর আলোটা জ্বাল; শীগ্‌গীর আলোটা জ্বাল।

নিতাই পকেটে হাতদিয়া দেখে, দিয়াশালাই নাই; সেই যে প্রথম বাতি জ্বালিতে গাড়োয়ানকে দিয়াছিল তাহারপর আর ফিরাইয়া লইতে ভুলিয়া গিয়াছে। সে রাখালের বিছানা হইতে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুরুচিকে বলিল, তুমি ব'স—ভয় নেই; আমি এক্ষুনি আলো নিয়ে আস্‌ছি। এই বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আকাশের মেঘের ঘোর তখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। ফোঁটা ফোঁটা জল তখনও পড়িতেছে। তাহাতেই অন্ধকার গলির মোড়ে একরকম দৌড়িয়া গিয়া নিতাই দেখিল, গাড়ীর সমস্ত খড়্‌খড়ি তুলিয়া দিয়া গাড়োয়ান তাহার ভিতর গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছে।

এই লেখকের—

আর একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস

"কালোমেয়ে"

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।